Stethoscope

Annual Magazine of TMC

TMSS Medical College

Stethoscope
Annual Magazine of TMC
TMSS Medical College

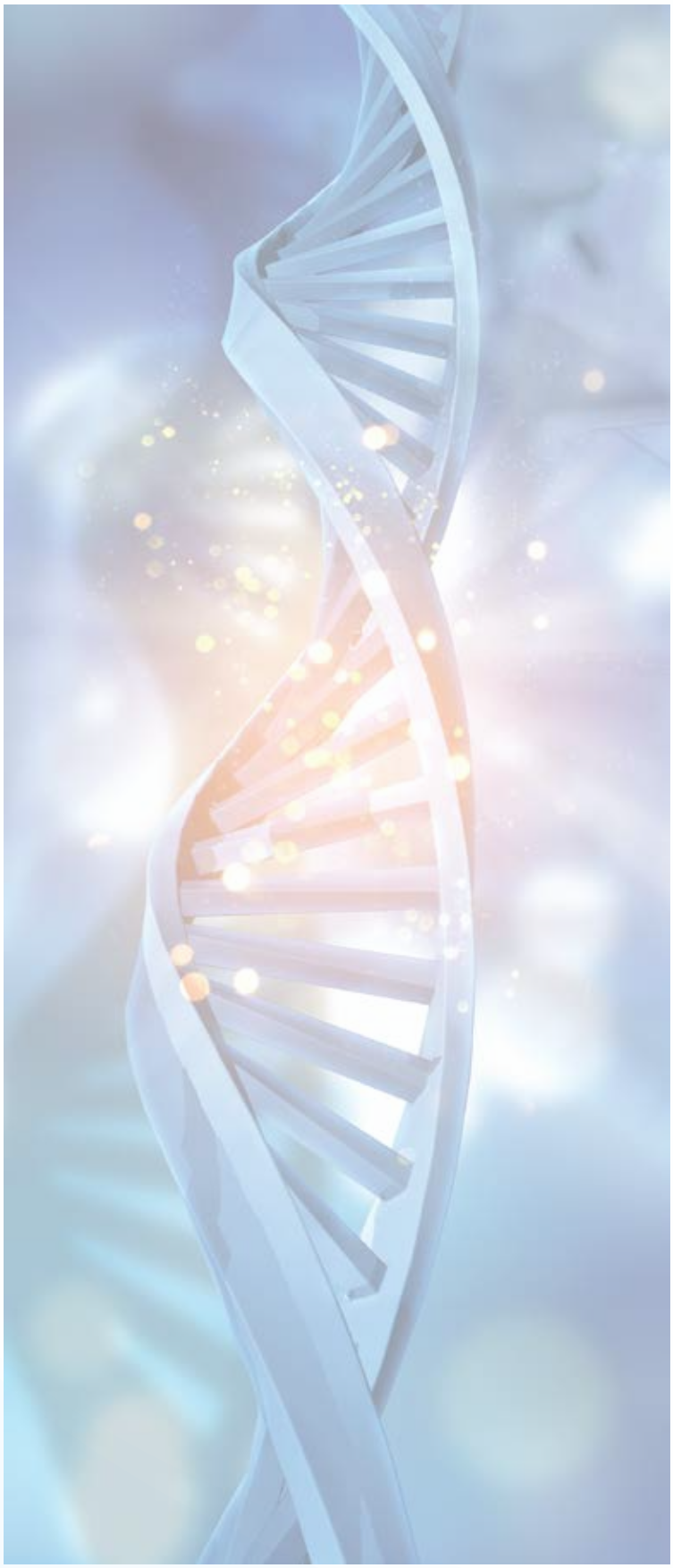

পৃষ্ঠপোষকতা

অধ্যাপিকা ড. হোসনে-আরা বেগম
(অশোকা ফেলো, পিএইচএফ এন্ড একেএস)
নির্বাহী পরিচালক
টিএমএসএস

উপদেষ্টা

রোটা. ডাঃ মোঃ মতিউর রহমান
এমবিবিএস, এমপিএইচ, পিএইচডি
উপ-নির্বাহী পরিচালক-২, টিএমএসএস।

সার্বিক ব্যবস্থাপনা

অধ্যাপক ডাঃ মোঃ শাহজাহান আলী সরকার
এমবিবিএস, এমফিল (এনাটমী)
অধ্যক্ষ, টিএমএসএস মেডিকেল কলেজ, বগুড়া

সম্পাদনা

অধ্যাপক ডাঃ নূরে ফারহানা ইসলাম
বিভাগীয় প্রধান, বায়োকেমিষ্ট্রি বিভাগ
টিএমএসএস মেডিকেল কলেজ

সার্বিক পরিচালনা ও দিক নির্দেশনা

মোঃ সজিবুর রহমান
সহকারী পরিচালক, টিএমএসএস ও
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
টিএমএসএস মেডিকেল কলেজ

ডিজাইন

মোঃ সিরাজুল ইসলাম
গ্রাফিক্স ডিজাইনার (টিপিপি)

মুদ্রণে

টিএমএসএস প্রিন্টিং প্রেস
ঠেঙ্গামারা, বগুড়া

সূচি

গল্পঃ

স্টেথোস্কোপ ৯
কালের খেয়া ১১
একাত্তরের স্বাস্থ্যযোদ্ধা ১২
সমুদ্রস্নান ১৪
আপেক্ষিকতা ১৫
R.I.P হিউম্যানিটি ১৬
শখের ডাক্তার ১৭
বাস্তবতা ১৮
The Motherly Tree ১৯
অনুভূতি ২০
Story Behind a Life ২১
জ্বলে ওঠো হে তরুণ ২১
Labyrinth ২২
সেল নং-৩৯ ২৩
চেতনায় বঙ্গবন্ধু ২৪

কবিতা, ধাধা, কৌতুকঃ

লকডাউন ২৫
মেডিকেল সমাচার ২৬
অনুভূতি ২৬
পাহাড়ের গল্প ২৭
নববধূর লজ্জা ২৮
বাবা ২৮
সময়ের ক্ষত ২৮
অনুপস্থিতি ২৮
নীরব ২৯
Hope ২৯
অপেক্ষা ২৯
Ailing lungs of Earth ২৯
ডাক্তারের স্বপ্ন ৩০
Peace and Joy of LIFE ৩০
LIFE ৩০
নদী অথবা নৌকা ৩০
কুহেলিকা ৩১
EDHOU ৩১
College Days ৩১
আমাদের টিএমএসএস ৩২
বাংলা না ইংরেজি ৩২
ধাঁধাঁ ৩৩
তথ্য কনিকা ৩৩
এক ডজন হাসি (সংগৃহীত) ৩৪
কৌতুক ৩৬
ফটো গ্যালারী ৩৭

বাণী

চেয়ারম্যান

টিএমএসএস মেডিকেল কলেজ, বগুড়া

সুবিধা বঞ্চিত উত্তরবঙ্গের অসহায় মানুষদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ও চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করার লক্ষে ২০০৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় টিএমএসএস মেডিকেল কলেজ। সরকারী বিভিন্ন নির্দেশনা যথাযথভাবে প্রতিপালন করে ছাত্র-ছাত্রীদের আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে এমবিবিএস কোর্স সম্পন্ন করার যাবতীয় সুবিধা বিদ্যমান রয়েছে। ছাত্র-ছাত্রীদের একাডেমিক কার্যক্রমের পাশাপাশি কো-কারিকুলার ও Extra-Curricular কার্যক্রমও যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হয়। একজন মানবিক, আন্তরিক ও সহানুভূতিশীল চিকিৎসক হিসেবে গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে সকল ধরণের কার্যক্রমে অংশগ্রহণ থাকা বাঞ্চনীয়। টিএমএসএস মেডিকেল কলেজ চিকিৎসা শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধিতে বিভিন্ন Innovative কাজ করে থাকে। যেমন- বাংলাদেশের মধ্যে প্রথম মেডিকেল কলেজ হিসেবে পূর্নাঙ্গ একাডেমিক ক্যালেন্ডারের মাধ্যমে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা, মিটিং ক্যালেন্ডার প্রণয়ন ইত্যাদি। তারই ধারাবাহিকতায় চিকিৎসা শিক্ষার উৎকর্ষতা বৃদ্ধিতে Annual Magazine প্রকাশ হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। সেই সাথে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এটি প্রকাশের সাথে সম্পৃক্ত সকলকে। এছাড়াও যারা এর সাথে জড়িত থেকে বিশেষকরে ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষক-শিক্ষিকা যারা এখানে বিভিন্ন ধরণের লেখার মাধ্যমে নিজেদের অতিরিক্ত প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন তাদেরকেও সাধুবাদ জানাই।

পরিশেষে টিএমএসএস মেডিকেল কলেজ এর একাডেমিক ও নন একাডেমিক কার্যক্রমের মানোন্নয়নে সম্পৃক্ত সকলকে বিশেষ ধন্যবাদ জানিয়ে Annual Magazine এর সফলতা কামনা করছি।

অধ্যাপিকা ড. হোসনে-আরা বেগম
(অশোকা ফেলো, পিএইচএফ এন্ড একেএস)

বাণী

উপ-নির্বাহী পরিচালক-২
টিএমএসএস

টিএমএসএস মেডিকেল কলেজ, উত্তরবঙ্গ তথা বাংলাদেশের বেসরকারী মেডিকেল কলেজগুলোর মধ্যে অন্যতম। চিকিৎসা শিক্ষার গুণমান বৃদ্ধিতে মানবিক চিকিৎসক গড়ে তোলার লক্ষে প্রতিনিয়ত কাজ করে যাচ্ছে এবং দেশের গন্ডি পেরিয়ে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে বিশেষ অবদান রাখছে ও দেশের সুনাম বৃদ্ধি করছে। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় একাডেমিক সুবিধার পাশাপাশি রয়েছে Co-curricular & Extra Curricular কার্যক্রম। ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়মিত লেখাপড়ার পাশাপাশি তাদের ভেতর লুকিয়ে থাকা বিভিন্ন প্রতিভাকে জাগ্রত করার লক্ষে বিভিন্ন খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বিতর্ক প্রতিযোগীতা, স্টুডেন্ট উইক ইত্যাদি আয়োজন করা হয়ে থাকে। এছাড়াও শিক্ষার মানোন্নয়নে সেন্টার ফর মেডিকেল এডুকেশন (সিএমই) এর নির্দেশনায় Quality Assurance Scheme (QAS) এর নির্দেশনা যথাযথভাবে প্রতিপালনের ধারাবাহিকতায় টিএমএসএস মেডিকেল কলেজ Annual Magazine প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত। সেই সাথে টিএমসি এর সকল শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ছাত্র-ছাত্রীদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি এই সুন্দর প্রকাশনার জন্য। ছাত্র-ছাত্রীদের মানসিক উৎকর্ষ সাধনের জন্য লেখাপড়ার পাশাপাশি এধরণের কার্যক্রমে স্বত:স্ফুর্ত অংশগ্রহণ ভবিষ্যতে তাদেরকে সকল ক্ষেত্রে এগিয়ে নিয়ে যাবে বলে আমার প্রত্যাশা ও বিশ্বাস।

(রোটা. ডাঃ মোঃ মতিউর রহমান)
এমবিবিএস, এমপিএইচ, পিএইচডি

বাণী

অধ্যক্ষ

টিএমএসএস মেডিকেল কলেজ, বগুড়া

টিএমএসএস মেডিকেল কলেজ ২০০৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়ে সরকারী নীতিমালা যথাযথভাবে প্রতিপালন সাপেক্ষে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। ছাত্র-ছাত্রীদের সুষ্ঠু বিনোদন ও মানসিক বিকাশে একাডেমিক কার্যক্রমের পাশাপাশি অন্যান্য বিভিন্ন ধরণের কো-কারিকুলার কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। পড়ালেখার পাশাপাশি অন্যান্য ক্ষেত্রে ছাত্র-ছাত্রীদের মেধা বিকাশে টিএমএসএস মেডিকেল কলেজ কর্তৃক Annual Magazine প্রকাশ করা হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। উক্ত ম্যাগাজিনে ছাত্র-ছাত্রীরা যেভাবে লেখা প্রকাশ করেছে তা দেখে আমি সত্যিই অভিভূত। সেই সাথে ধন্যবাদ জানাচ্ছি ম্যাগাজিন প্রকাশের সাথে সম্পৃক্ত সকলকে। ছাত্র-ছাত্রীদের মেধা বিকাশে পড়াশুনার পাশাপাশি এ ধরণের কর্মকান্ড অব্যাহত থাকবে বলে আমি আশা রাখি।

অধ্যাপক ডাঃ মোঃ শাহজাহান আলী সরকার

এমবিবিএস, এমফিল (এনাটমী)

সম্পাদকীয়

এ্যানুয়েল ম্যাগাজিন প্রকাশ কমিটি

মেডিক্যালের কঠিন পড়াশোনার পাশাপাশি আমাদের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা সাহিত্যচর্চায়ও যে অনেকটা এগিয়ে-তা বুঝতে পারলাম এ সাহিত্য ম্যাগাজিন প্রকাশ করতে গিয়ে। অনেক ভাল মানের লেখা এসেছে আমাদের কাছে। সম্পাদনা করতে গিয়ে সকলের লেখা ছাপতে পারিনি বলে দুঃখিত। শিক্ষার্থীদের এ সাহিত্যনুরাগ পেশা জীবনে গিয়েও যেন চলমান থাকে এটাই কামনা করি।

ইংরেজি সাহিত্যের প্রখ্যাত অনেক সাহিত্যিক William Carlos Williams, John Keats, Anton Chekov, Sir Arthur Konan Doyle, William Somerset Maugham প্রমূখ এবং বাংলা সাহিত্যের বিখ্যাত ছোটগল্পকার বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল), ঔপন্যাসিক নিহাররঞ্জন গুপ্ত পেশায় সফল চিকিৎসক ছিলেন।

চিকিৎসকগণ কলম দিয়ে শুধু শুধু ব্যবস্থাপত্রই লিখবেন না, কবিতা, গল্প, সাহিত্য রচনাও করবেন। ছুরি, কাঁচি দিয়ে অপারেশন করে মানুষকে সুস্থ্য করার পাশাপাশি সৃজনশীলতার মাধ্যমে মানুষের মননকেও সুস্থ করে তুলবেন। চিকিৎসাশাস্ত্রে চরম উন্নতি সাধনের সাথে সাথে আমাদের ভবিষ্যৎ চিকিৎসকগণ সৃজনশীলতা ও মননশীলতায় অনেকখানি এগিয়ে থাকবে-এ প্রত্যাশা করি।

NF Islam

অধ্যাপক ডাঃ নূরে ফারহানা ইসলাম

এমবিবিএস, এমফিল (বায়োকেমিস্ট্রি)

স্টেথোস্কোপ

ডাঃ মোঃ শহীদুল ইসলাম
সহকারী অধ্যাপক
ইন্টারন্যাল মেডিসিন বিভাগ, টিএমসি

ফুসফুস কিংবা হৃৎপিন্ডের কোন সমস্যা নিয়ে আমরা যখন কোন চিকিৎসকের কাছে যাই তখন একটি যন্ত্রের একাংশ নিজ কানে আরেক অংশ রোগীর বুকে ধরে তিনি পরীক্ষা করেন, এই যন্ত্রটি স্টেথোস্কোপ।

স্টেথোস্কোপই এখন একজন ডাক্তারকে চেনার সবচেয়ে সহজ এবং প্রচলিত মাধ্যম। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীতে এটি ছাড়াই ডাক্তারকে রোগীর হৃদস্পন্দনের হিসেব করতে হতো। মূলত হাত দিয়ে নাভী অনুভব করে বা বুকে কান পেতে হৃদস্পন্দন শুনে ডাক্তারকে সিদ্ধান্ত নিতে হতো। একে বলা হয় Immediate Auscultation.

১৮১৬ সালে ফরাসী ডাক্তার রেনে থিওফাইল হায়াসিন্থে লেনেক (Rene Theophile Hyacinthe Laennec) এক রোগীর হৃদস্পন্দন পরীক্ষা করতে গিয়ে অদ্ভুত পরিস্থিতির সম্মুখীন হন। রোগী অত্যাধিক স্থূল হওয়ায় রেনে হাত দিয়ে নাড়ী পরীক্ষা করতে পারছিলেন না। আবার রোগী একজন তরুণী বলে বুকে কান পেতেও পরীক্ষাটি করতে পারছিলেন না। ফলে সমস্যা সমাধানের জন্য আশ্রয় নেন শব্দ বিজ্ঞানের।

তাঁর মনে পড়ে ওই পদ্ধতির কথা, যেখানে কাঠের টুকরার এক পাশে কান রেখে অন্যপাশে টোকা দিলে স্পষ্টভাবে শোনা যায়। সাথে সাথে তিনি এক দিস্তা কাগজ রোল করে সিলিন্ডারের মতো বানান, সেটার একপাশ রোগীর বুকের উপর রেখে অপর পাশে নিজের কান লাগান। তিনি লক্ষ্য করেন, এতে করে হৃদস্পন্দন আরো বেশি স্পষ্টভাবে শোনা যায়, সরাসরি কান পেতেও ওতোটা শোনা যায়নি। কারণ বায়ু মাধ্যম থেকে কঠিন মাধ্যমে শব্দের বেগ বেশি। মাঝখানে একটা মিডিয়া ব্যবহার করে হৃদস্পন্দন শোনার প্রক্রিয়াকে বলে Mediate auscultation.

কথিত আছে, এই আইডিয়াটি রেনের মাথায় এসেছিলো ছোট বাচ্চাদের খেলা দেখে। ১৮১৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে, ঠান্ডা ঠান্ডা এক সকালে ল্যুভর প্রসাদের আঙিনা দিয়ে হাঁটার সময় পঁয়ত্রিশ বছর বয়সী রেনে দেখেন দুটি বিদ্যালয় পড়ুয়া শিশু একটা লম্বা

লম্বা আর ফাঁপা কাঠ দিয়ে খেলছে। একজন এক প্রান্তে পিন দিয়ে আঁচড় কাটছে, অন্যজন আরেক প্রান্তে কান লাগিয়ে শুনছে। কাঠটি আঁচড়কে অ্যামপ্লিফাই করে অপর প্রান্তে পৌঁছে দিচ্ছে। ডাক্তার লেনেকের পদার্থবিজ্ঞানের সূত্র মনে পড়লো, কঠিন মাধ্যমে শব্দ দ্রুত পরিবাহিত হয়।

রেনের তৈরী প্রথম স্টেথোস্কোপটি ছিলো ২৫ সেন্টিমিটার লম্বা আর ২.৫ সেন্টিমিটার প্রস্থ বিশিষ্ট কাঠের ফাঁপা সিলিন্ডার। এই যন্ত্রের নাম রেনে "স্টেথোস্কোপ" রেখেছিলেন কারণ Stetho মানে বুক এবং Skopos মানে অনুসন্ধান। তবে যন্ত্রটিকে তৎকালীন চিকিৎসক সমাজ খুশী মনে গ্রহণ করেননি।

১৮৫১ সালে আথার লিরেড দুই এয়ার পিস যুক্ত আধুনিক স্টেথোস্কোপ উদ্ভাবন করেন এবং পরবর্তী বছর ১৮৫২ সালে জর্জ ক্যামান এটির নকশাকে খুতমুক্ত করে বানিজ্যিক উৎপাদন শুরু করেন।

১৮৬০ সালে হার্ভার্ড মেডিকেল স্কুলের শিক্ষক ডেভিড লিটম্যান একটি হালকা এবং উন্নতমানের স্টেথোস্কোপ তৈরী করেন। এটি ছিলো আরো কঠিন ও পাতলা এবং তুলনামূলক নিখুঁত শব্দ পরিবহন করতো। এখন পর্যন্ত তুমুল জনপ্রিয় এই স্টেথোস্কোপ। প্রতিটি মেডিকেল স্টুডেন্ট কিংবা ডাক্তারের একটি শখের জিনিস এই লিটম্যান। বর্তমানে বিভিন্ন ধরনের স্টেথোস্কোপ পাওয়া যায়। এদের মধ্যে রয়েছে-

* **অ্যাকুইস্টিক স্টেথোস্কোপ (Acoustic Stethoscope)**
  বাংলাদেশে এটি মূলত ব্যবহার করা হয়। চেস্ট পিসের মাধ্যমে গৃহীত শব্দ ফাঁপা টিউবের মাধ্যমে কানে পৌঁছে যায় এটি দ্বারা।
* **ইলেকট্রনিক স্টেথোস্কোপ (Electronic Stethoscope)**
  এই ধরনের স্টেথোস্কোপ শব্দ তরঙ্গকে প্রথমে বৈদ্যুতিক শক্তিতে রূপান্তরিত করে। তারপর সেটিকে বর্ধিত করে জোরালো ও পরিস্কার শব্দে রূপান্তরিত করে।
* **রেকর্ডিং স্টেথোস্কোপ (Recording Stethoscope)**
  এই স্টেথোস্কোপে শব্দ রেকর্ড করে রাখার ব্যবস্থা রয়েছে। ফলে পরবর্তীতে রেকর্ডকৃত শব্দ বিশ্লেষণ করে রোগ নির্ণয় করা হয়।
* **ফিটাল স্টেথোস্কোপ (Fetal Stethoscope)**
  জরায়ুতে ভ্রূনের হৃদস্পন্দন শোনা যায় এই স্টেথোস্কোপের সাহায্যে।

স্টেথোস্কোপ যেটাই হোক না কেন তা দ্বারা দ্রুত শব্দ বিশ্লেষন করে অনেক জটিল রোগ সহজেই নির্ণয় করা যায়। তাই আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানে স্টেথোস্কোপের আবিস্কার অবশ্যই এক যুগান্তকারী অধ্যায়।

কালের খেয়া

ডাঃ মাহফুজুর রহমান
বিডিএস, ডিডিএস
সহকারী অধ্যাপক, ডেন্টাল এনাটমী বিভাগ
টিএমসি ডেন্টাল ইউনিট।

সময় স্বভাবতই বহমান। সময়ের সাথে সাথেই পরিবর্তিত হতে থাকে আশা-আকাঙ্খা, চাওয়া-পাওয়া আর চিন্তা-চেতনাও। এক সময় যা ছিল পরম আরাধ্য, বহু কাঙ্খিত, সময়ের ব্যবধানে তা ফিকে হয়ে আসে, হয়ে উঠে অনাকাঙ্খিত বা অনভিপ্রেত অথবা অযাচিত। আসলে এ খন্ড খন্ড সময়ের সমষ্টিইতো জীবন। জীবন নদীতে কালের খেয়া বয়ে চলে অবিরাম। চলার বাঁকে বাঁকে কিছু স্মৃতি, কিছু পাওয়া রাঙিয়ে তুলে জীবনকে, রোমাঞ্চিত করে অনুভূতি গুলো। আবার কিছু অনাকাঙ্খিত ঘটনা জীবন কে তোলে বিষাদময়। কালের খেয়া তবু থামেনা, চলে অবিরাম। "পথের প্যাঁচালি" পড়ার সময় অপু চরিত্রের মাঝে আমরা অনেকেই নিজেকে খুঁজে ফিরি। সোনা ঝরা সেই দিন গুলি আমাদের নস্টালজিয়ায় ভোগায়। আহ! কী সেই দুরন্ত শৈশব- কৈশরের দিনগুলি। স্কুল পালিয়ে ক্রিকেট খেলা, ঘুড়ি উড়ানো, বৃষ্টিতে ভেজা, মাঝে মাঝে দল বেঁধে নদীতে গোসল করা, মাছ ধরা, বার্ষিক পরীক্ষা শেষে আত্মীয় - স্বজনের বাড়ী বেড়াতে যাওয়া, আবার ঈদে নতুন জামা-কাপড় - সব মিলিয়ে যেন রুপে-রঙে-রসে ভরপুর। কত ভালই না হতো! সেই দিন গুলি আবার ফিরে আসলে। কবি নির্মলেন্দু গুণের কথায়- " জন্মের প্রয়োজনে ছোট ছিলাম, মৃত্যুর প্রয়োজনে বড় হচ্ছি।" আসলেই এক একটি বসন্ত যাচ্ছে আর গভীর ভাবে উপলব্ধি করছি "কারে তুই ফেলে এসেছিস মন, মনরে আমার।"

মাধ্যমিক পর্যন্ত এভাবেই হেসে-খেলে চলে যায় বসন্তের দিনগুলি। উচ্চ মাধ্যমিকে জীবন জগৎ সম্পর্কে সচেতনতা অনুভূত হয়, পড়াশুনায় বিশেষ মনোযোগীতা আর ক্যারিয়ার গঠনের দিক গুলো অগ্রাধিকার পায়। তখন ভাবতাম বা বোঝানো হতো এ কটা দিন কষ্ট করে ভাল কোথাও এডমিশন নিলেই শান্তি আর শান্তি। ডেন্টালে ভর্তি হবার পর সেই ধারনা যারপরনাই উড়ে গেল। শান্তির শ্বেত কবুতর টি রয়ে গেল কেবলই অধরা। দিন দিন আইটেম কার্ড, টার্ম নামের পরীক্ষাগুলো বাড়তে লাগলো, সাথে সাথে কমতে লাগলো সুকুমার বৃত্তিগুলো চর্চার সময়। আর ইট কাঠ-পাথরের ঢাকা শহরে বন্দী হয়ে গেল সবুজ প্রাণ টি। উঁচুউঁচু অট্টালিকা বাঁধা হয়ে দাঁড়ায় আকাশ দেখতে, কত দিন হাঁটা হয়না শিশির স্নাত সবুজ ঘাসে- তার হিসেব কে রাখে। সকাল আটটা থেকে আড়ায়টা ক্লাশ, বিকেলে লাইব্রেরী। মাঝে মাঝে বিকালে জুনিয়র-সিনিয়র ভাইদের সাথে ঘুরতে যাওয়ায় ছিল একমাত্র বিনোদনের মাধ্যম। ক্যাম্পাসে কারও প্রতি বিশেষ 'ভালোলাগাতেই' সীমাবদ্ধ থেকে যায় অথবা কারও বিশেষ আকার ইঙ্গিত বুঝেও না বুঝার ভান করে এড়িয়ে যেতে হয়-মধ্যবিত্ত পরিবারের উত্তরসুরী বলে অথবা 'আদর্শ' কে জিইয়ে রাখার খাতিরে। প্রফেশনাল পরীক্ষার আগে-পরের দিনগুলোতে যে দৈহিক ও মানসিক স্ট্রেস যেত - তা মনে করলে এখনো একটা হিম শিতল অনুভূতি শীরদাড়া বেয়ে নিচে নেমে যায়। ইন্টার্ণ পিরিয়ডটা হেসে খেলে দেখতে দেখতেই চলে যায়। প্রকৃত ডাক্তার হবার স্বাদটা মোটামুটি তখন থেকেই পেতে শুরু করি-ম্যাক্সিলোফেসিয়াল সার্জারীর কেস গুলো, অর্থোডন্টিকস এর কাজগুলো যেন হাতছানি দিয়ে ডাকে। ইন্টার্নশীপ শেষ করে অদ্ভুত এক আইডেনটিটি ক্রাইসিস এ পরতে হলো, অবশ্য দু তিন মাস পরেই একটি ডেন্টাল কলেজে লেকচারার পদে চাকুরী জুটে যাওয়া তা বেশী দীর্ঘায়িত হয়নি। ভালই চলছিল শিক্ষকতার দিনগুলি কিন্তু ছয় মাস না যেতে না যেতেই এক বোধ কাজ করে -এটাই কি আমার আসল পরিচয়? চাকুরী ছেড়ে পোষ্ট গ্রাজুয়েশনের জন্য চেষ্টা শুরু করি। আল্লাহর রহমতে কিভাবে যেন প্রথম বারেই ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তির সুযোগ হল এবং ভর্তি হলাম। আবার কিছু দিন পরে এফসিপিএস ১ম পর্ব উর্ত্তিণ হই। তারপর আবার ৩৭তম বিসিএস পরীক্ষার প্রজ্ঞাপন জারী হয়- এবার বিসিএস- সে তো আরেক যুদ্ধের প্রস্তুতি। এভাবেই যেন Apoptosis এর মত আমাদের জীবনটাও সিকুয়েন্সিয়ালী প্রোগ্রাম করা আছে। ক্যারিয়ারের পিছনে দৌড়াতে দৌড়াতে কখন যে জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান, সবচেয়ে উর্বর সময়টুকু অযন্তে আর অপাত্রে (!) ব্যয় করে ফেলেছি- তার হিসেব রাখা হয়নি। একটা জিনিস এ পড়ন্ত বেলায় এসে তাড়িত করে- পরবর্তী ৩০-৪০ বছর ভালো থাকার জন্য কত ত্যাগ, কত পরিশ্রমই না করেছি। একজন মুসলমান হিসেবে পরকালীন অনন্ত অসীম সময়ের জন্য কতটুকু প্রস্তুতি নিয়েছি? পার্থিব আর জাগতিক ব্যস্ততার পেছনে ছুটতে ছুটতে আবশ্যম্ভাবী গন্তব্য কী ভূলে গেছি?

পুনশ্চ

জীবনের প্রতিটি স্তরেরই আলাদা আলাদা সৌন্দর্য রেয়েছে। তাই প্রতিটি স্তরকেই উপভোগ করতে হবে তার দাবী অনুযায়ী। তাহলে এ পড়ন্ত বেলায় কষ্ট করে স্মৃতি রোমন্থন করে সুখ খুজতে হবে না। শুধু তাই নয়- কালের খেয়া চলতে চলতেই, ওপারের ডাক আসার আগেই প্রস্তুতি নিতে হবে আবশ্যম্ভাবী সেই মহাদিনের জন্য।

একাত্তরের স্বাস্থ্যযোদ্ধা

শিহাব উদ্দিন
ব্যাচ: ১১
রোল: ১১০

যাদের অবদানে স্বাধীন বাংলাদেশ

ডা. ফজলে রাব্বি, ডা. আজহারুল হক
ডা. আ.আ. শামসুল হল মিলন, ডা. জিকরুল হক

বাঙালির সবচেয়ে গর্বের ইতিহাস ১৯৭১। টানা নয় মাসের অগ্নিঝরা সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বাঙালি পাকিস্তানি হানাদারদের হাত থেকে ছিনিয়ে আনে স্বাধীনতা। এই রক্তাক্ত সংগ্রামে দেশের আপামর মানুষ যেমন ঝাঁপিয়ে পড়েন তেমনইভাবে চিকিৎসকরা স্বাধীনতার যুদ্ধে নিজেদের বীরত্বগাঁথা ইতিহাস রচনা করেছেন। মহান মুক্তিযুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন চিকিৎসকরা। অনেক চিকিৎসক শহীদ হন, অনেকেই পঙ্গুত্ব বরণ করেন। তারা আমাদের একাত্তরের স্বাস্থ্যযোদ্ধা, চিকিৎসক সমাজের সবচেয়ে বড় অহংকার। একদিকে বিপুল সংখ্যক চিকিৎসক ও মেডিকেল শিক্ষার্থী সক্রিয়ভাবে অস্ত্রহাতে শত্রুপক্ষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। আবার অন্যদিকে শরনার্থী শিবির এবং দেশের অভ্যন্তরে আরেকদল চিকিৎসক সেবা শুশ্রুষায় সুস্থ্য করে তোলেন আহত মুক্তিযোদ্ধাদের। অনেকেই অস্ত্র হাতে যুদ্ধে অংশগ্রহন করেন।

ডা. শিশির মজুমদার, ডা. সরয়ার আলীদ, অধ্যাপক সৈয়দ মোদাচ্ছের আলী, ডা. ওয়াজেদুল ইসলাম খান, ডা. মাকসুদা নার্গিস, ডা. কাজী তামান্না, ডা. ফৌজিয়া মোসলেম ও ডা. সমীর শর্মা প্রমূখ।

মেডিকেল কলেজের তৎকালীন ছাত্রদের মধ্যে বিভিন্ন সেক্টরে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে শাহ আলম (পরবর্তীতে বীরউত্তম খেতাব প্রাপ্ত) মোয়াজ্জেম হোসেন, সেলিম আহমেদ, আলী হাফিজ সেলিম, আবু ইউসুফ মিয়া, ইকবাল আহমেদ ফারুক, মুজিবুল হক, মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিন, আমজাদ হোসেন, মোজাফ্ফর, ওয়ালী, ওসমান, গোলাম কবীর, জিল্লুর রহিম, ডালু, নুরুজ্জামান, শাহাদত প্রমুখ মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

বাংলাদেশের প্রথম হাসপাতাল "বাংলাদেশ ফিল্ড হাসপাতাল"। একাত্তরে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালীন ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের মেঘালয়ে প্রতিষ্ঠা করা হয়। আহত মুক্তিযোদ্ধা আর শরনার্থীদের সেবায় নিয়োজিত এই হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেন ডা. মো. আব্দুল মবিন এবং ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী। সেক্টর-২ এর সেখানকার কমান্ডিং অফিসারের দায়িত্ব পালন করতেন ডা. ক্যাপ্টেন সিতারা রহমান (পরবর্তীতে তিনি বীরপ্রতীক খেতাব পান)।

ডা. ফজলে রাব্বীসহ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের অবদান:

মুক্তিযুদ্ধে চিকিৎসকদের কথা বললেই প্রথমে যে নামটি চলে আসে, তিনি হচ্ছেন ঢাকা মেডিকেলের কার্ডিওলজি বিভাগের অধ্যাপক ডা. ফজলে রাব্বি। তিনিই ঢাকা মেডিকেলে যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের সেবা দিতে টিম গঠন করেন। তার সঙ্গে যুক্ত হন মিটফোর্ড হাসপাতালের চক্ষু বিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডা. আলিম চৌধুরী। মিটফোর্ডের ডাক্তার হলেও সেবার স্বার্থে বেশিরভাগ সময় তিনি ঢাকা মেডিকেলেই থাকতেন।

যুদ্ধে আহত রোগীদের অপারেশন সংশ্লিষ্ট সব দায়িত্ব ছিল সার্জারী বিভাগের অধ্যাপক ডা. সামসুদ্দিন আহমেদের। তার সহযোগী হিসেবে সহকারী সার্জন ছিলেন ডা. আজহারুল হক ও ডা. এ বি এম হুমায়ুন কবির। এই দুজনে জরুরী বিভাগের দায়িত্বে ছিলেন। রোগী ভর্তি করার জন্যও অনেক প্রতিকূলতা পোহাতে হতো। অনেক সময় ডাক্তারদের হাসপাতালে প্রবেশ করতে হতো রোগী হিসেবে। ডা. আজহারুল হক কিছু রোগীর চিকিৎসা করতেন হাতিরপুলে তার নিজের বানানো ডিস্পেন্সসারি "সাঈদা ফার্মেসী" তে।

ঢাকা মেডিকেল কলেজের ১ম বর্ষের ছাত্রী নিপা লাহিড়ী যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য ভারতে যাবার পথে ফতুল্লায় নিহত হন। আর একজন ছাত্র সিরাজুল ইসলাম হাসপাতালে বিভিন্নভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য করতেন। তিনি রাতে হোস্টেলে না গিয়ে হাসপাতালের ক্যান্সার ওয়ার্ডে ঘুমাতেন। ১১ ডিসেম্বর রাতে রাজাকার বাহিনী তাকে ক্যান্সার ওয়ার্ড থেকে তুলে নিয়ে যায় এবং রায়েরবাজার বধ্যভূমিতে নির্মমভাবে হত্যা করে।

তৎকালীন সেনাবাহিনীর মেডিকেল কোরের সদস্যদের মধ্যে স্কোয়াড্রেন লিডার এম শামসুল হক, মেজর খুরশীদ, শামসুল আলম, ক্যাপ্টেন আব্দুল লতিফ মল্লিক, ক্যাপ্টেন মোশারফ হোসেন, ক্যাপ্টেন আব্দুল মান্নান, লে. আখতার, লে. নুরুল ইসলাম প্রমুখ অফিসারবৃন্দ বিভিন্ন সেক্টরে নিয়োজিত ছিলেন। তাদের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য ক্যাপ্টেন খুরশিদ বীরউত্তম ও লে. আখতার বীরপ্রতীক উপাধি পেয়েছিলেন। তৎকালীন পাকিস্তান সেনাবাহিনীর মেডিকেল কোরের যে সমস্ত সদস্য শহীদ হয়েছেন তাদের মধ্যে ডা. লে.ক. এএফ জিয়াউর রহমান, ডা. মেজর আসাদুল হক, ডা. লে. আমিনুল হক, খন্দকার আবু জাফর, মো. নুরুল ইমাম প্রমূখ ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্র ছিলেন।

মুক্তিযুদ্ধের সময় চিকিৎসক, মেডিকেল কলেজের ছাত্র, কলেজ ও হাসপাতালের নানা শ্রেণীর কর্মকর্তা - কর্মচারীরা অবদান রেখেছেন নানাভাবে। কেউ যুদ্ধে অংশ নিয়েছেন অস্ত্র হাতে, কেউ আবার হাসপাতালে যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসাসেবা দিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। আবার অনেক চিকিৎসক মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্র সরবরাহে সাহায্য করেছেন, সহযোগিতা করেছেন তথ্য আদান-প্রদানে। চিকিৎসকদের গাড়িতে করে পার হয়েছেন মুক্তিযোদ্ধা, আনা হয়েছে অস্ত্র ওষুধসহ নানাকিছু। চিকিৎসাসেবা মানব ধর্ম-সেটা মুক্তিযুদ্ধের সময় পদে পদে চিকিৎসকরা শিখিয়েছেন, করে দেখিয়েছেন। মুক্তিযুদ্ধের সময়ে তাদের ভূমিকা ছিল অনন্য এবং ব্যতিক্রমী।

এই ভূমিকা পালন করতে গিয়ে চরম মূল্যও দিতে হয়েছে চিকিৎসকদের একটা বিরাট অংশকে। চক্ষু বিশেষজ্ঞ আলীম চৌধুরীকে ১৯৭১ সালের ১৫ ডিসেম্বর রাজাকার-আলবদর বাহিনী তার বাসা থেকে নিয়ে যায় এবং ওই দিবাগত রাতে রায়েরবাজার বধ্যভূমিতে নির্মমভাবে হত্যা করে। ডা. ফজলে রাব্বীকে ১৯৭১ সালের ১৫ ডিসেম্বর বিকেলে পাকবাহিনীর কয়েকজন সৈন্যসহ রাজাকার-আলবদরদের কয়েকটি দল তার সিদ্রেশ্বরী বাসা থেকে নিয়ে যায় এবং ১৮ ডিসেম্বর দিনের বেলায় রায়েরবাজার বধ্যভূমিতে পাওয়া যায় তার ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ। শুধু ডা. ফজলে রাব্বী এবং ডা. আলীম চৌধুরীই নয়, মুক্তিযুদ্ধের সময় পাক হানাদার বাহিনী হত্যা করে অধ্যাপক ডা. শামসুদ্দীন আহমেদ, অধ্যাপক ডা. হুমায়ুন কবীর, ডা. আজহারুল হক, ডা. সোলায়মান খান, ডা. আয়েশা বদেরা চৌধুরী, ডা. কসির উদ্দিন খান, ডা. মনসুর আলী, ডা. মোহাম্মাদ মোর্তজা, ডা. মফিজউদ্দীন খান, ডা. জাহাঙ্গীর, ডা. নুরুল ইমাম, ডা. এস.কে. সাহা, ডা. হেমচন্দ্র বসাক, ডা. ওবায়দুল হক, ডা. আসাদুল হক, ডা. মোসাব্বের আহম্মেদ, ডা. আজহারুল হক (সহকারী সার্জন), ডা. মোহাম্মাদ শফীকেও।

মুক্তিযুদ্ধের সময় এসব মহান চিকিৎসকদের নিয়ে একটি বই লিখেছেন দ্যা ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব প্রিভিলেন্স অ্যান্ড সোশ্যাল মেডিসিনের (নিপসম) পরিচালক ডা. বায়জীদ খুরশীদ রিয়াজ। ২০০৯ সালে প্রকাশিত এই বইতে তিনি প্রায় ১০০ জন চিকিৎসকের এবং ১৫ জন মেডিকেল শিক্ষার্থীর ভূমিকার কথা উল্লেখ করেছেন।

একাত্তরের এইসব অস্ত্রহাতে যুদ্ধ করা চিকিৎসক এবং যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের সেবাদানকারী স্বাস্থ্যযোদ্ধা চিকিৎসকদের আলোচনা আমরা খুব একটা শুনতে পাই না। অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো এখানেও চিকিৎসকদের আলোচনা পাদপ্রদীপের আলোর নিচে থাকে না। কিন্তু একাত্তরের অস্থির সময়ে যারা তাদের হাতে সেবা এবং চিকিৎসা পেয়েছিলেন, কেবল তারাই জানেন, এসব স্বাস্থ্যযোদ্ধার গুরুত্ব কতখানি।

সমুদ্রস্নান

সালমান করিম

৮ম ব্যাচ, রোল-৬৯

পৃথিবীর বৃহৎ সমুদ্র সৈকত কক্সবাজার। প্রায় ১২০কি.মি. দীর্ঘ এই সৈকতকে বাংলাদেশের পর্যটন রাজধানী বলা হয়। সারি সারি ঝাউবন, সৈকতে আছড়ে পড়া বিশাল ঢেউ আর সকাল বেলার লাল সূর্য। অস্তের সময় দিগন্তের চারদিকে আরো স্বপ্নিল রং মেখে সে বিদায় নেয়। বান্দরবন থেকে আমরা ২৯ ডিসেম্বর ২০১৭ সাল শুক্রবার সকাল ৯ টায় কক্সবাজারের উদ্দেশ্যে রওনা হই। বাসের ভেতর থেকে বান্দরবনের পাহাড় উচু নিচু রাস্তা গুলো দেখতে খুব সুন্দর লাগে। যদিও বান্দরবন অনেক সুন্দর ছিল তারপরেও কক্সবাজার যাওয়ার জন্য আমরা সবাই খুব বেশী আগ্রহী ছিলাম। দুপুর ২টায় আমরা হোটেল কল্লোলে পৌছালাম। আগে থেকেই সবার রুম নাম্বার জানা ছিল তাই কোন সমস্যা হয়নি। ফ্রেশ হয়ে মেরিডিয়ান রেস্তোরাতে আমরা আমাদের লাঞ্চ করলাম। বিকেলে ফ্রেন্ডরা মিলে সমুদ্র দর্শনে গেলাম। আমাদের হোটেল ছিল লাবনী বীচের একদম কাছে, পায়ে হেটে ২মিনিটের রাস্তা। সমুদ্রের পানিতে গোসল করার আলাদা একটা মজা আছে। শুধু ঢেউয়ের সাথে গা ভাসিয়ে দিলেই হয়, আপনি নিজে নিজেই ঢেউয়ের সাথে পায়ের কাছে চলে আসবেন। আমরা প্রায় ২.৫ ঘন্টা পানিতেই ছিলাম। অবশেষে ট্যুরিস্ট পুলিশের কড়াকড়িতে উঠতে হল, কারন ভাটার সময় হয়ে আসছিল। হোটেলে ফিরে এলাম আর নিয়ে আসলাম প্যান্টের পকেট ভর্তি বালু। প্রায় ১০ মিনিট ধরে বালির সাথে যুদ্ধ করে গোসল করলাম। তারপর ২০-২৫ জন মিলে চলে গেলাম সূর্যাস্ত দেখার জন্য। সমুদ্রের পাড়ে দাড়িয়ে সূর্যাস্ত দেখা ছিল কল্পনা সেটা আজ বাস্তবে রুপ নিল। এই সৌন্দয্য ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব না। সেখান থেকে ফিরে আমরা ৫জন চলে গেলাম সোজা বার্মিজ মার্কেট। হালকা কেনাকাটা শেষে রাত ৯টার মধ্যে হোটেলে ফিরে ডিনার করলাম। পরদিন সকালের নাস্তা সেরে রওনা হলাম হিমছড়ি ও ইনানী বীচের উদ্দেশ্যে। বাসে করে গেলাম আমরা। আমাদের জন্য ৩টা বাস ছিল। হিমছড়িতে যেতে হয় ক্যান্টনমেন্ট এরিয়ার ভেতর দিয়ে। তাই রাস্তাগুলো খুবই সুন্দর ছিল। রাস্তার একপাশে বিশাল সমুদ্র সৈকত ও ঝাউবন আরেকপাশে পাহাড় দেখতে দারুন লাগছিল। কেউ কক্সবাজার এলো আর এই পথ ধরে ছুটলো না, তার পুরো ভ্রমনই মাটি। এখানে একটি ছোট পর্যটন কেন্দ্র আছে, ভেতরের পরিবেশটা বেশ সুন্দর। পাহাড়ের উপরে আছে অনেকগুলো বিশ্রামাগার। প্রায় ২ শতাধিক সিড়ি মাড়িয়ে ওপরে উঠতে হয়। ওপরে উঠার পরই চোখে পড়বে বিশাল সমুদ্র সৈকত আর পাহাড়। একপাশে যেদিকে চোখ যায় শুধু পাহাড় আর পাহাড় আর অন্যদিকে বিশাল সমুদ্র। দোকানি ডাব নিয়ে বসে আছে, কিনে দেওয়ার মত কেউ ছিল না তাই নিজেকেই কিনতে হলো। হিমছড়িতে আমরা প্রায় ২ ঘন্টার মত ছিলাম। পাহাড় থেকে নেমে রাস্তার পাশের সমুদ্র সৈকতে একটু ঘুরে আসার লোভটা সামলাতে পারিনি। ড. সুজন স্যার ও ড. সুকান্ত স্যার এর সাথে আমরা কয়েকজন সেখানে হাটতে যাই। ইনানী বীচে যাওয়ার তাড়া ছিল তাই সেখানে বেশী সময় থাকা হয়নি। তাড়াহুড়া করে বাসে উঠে পড়লাম আমরা। হিমছড়ি থেকে একটু দূরেই ইনানী বিচ। এটি আসলে বিস্তৃর্ণ পাথুরে সৈকত। সমুদ্র থেকে ভেসে এসে এখানকার বেলাভূমিতে জমা হয়েছে প্রচুর প্রবাল পাথর। শুনেছি এখানে দাড়িয়ে যে কেউ এটাকে সেন্টমার্টিন বলে ভূল করে বসে। যেহেতু সময় স্বল্পতার জন্য আমরা সেন্টমার্টিন যেতে পারিনি তাই এ ব্যাপারে কিছু বলতে পারছি না। প্রবালের ওপর দাড়িয়ে সমুদ্র দেখার মজাই আলাদা। যদিও মানুষের ভিড়ের জন্য একটু বিরক্ত লাগছিল। তারপরেও আমরা সেখানে অনেক মজা করেছি। আমাদের সাথে সেখানে ছিলেন প্রফেসর ড. নূর এ ফারহানা ম্যাম, ড. সুকান্ত স্যার এবং ড. সুজন স্যার। আমাদের সাথে স্যার-ম্যাম সমুদ্রের পানিতে নেমেছেন। আমরা সবাই ওখানে অনেক মজা করি। দুপুরে আমরা হোটেলে ফিরে আসি। রাস্তায় ড. আজফারুল হাবিব স্যার ফোন দিয়ে বললেন তিনি কক্সবাজার এসেছেন। শুনে খুব ভালো লাগছিল। এখানে বলে রাখা ভাল যে স্যার এর মিসেস হঠাৎ অসুস্থ হওয়ায় স্যারকে ঢাকায় চলে যেতে হয়েছিল। স্যারকে পেয়ে আমরা সবাই খুব খুশি হই। বিকেলে আমরা কয়েকজন বন্ধু মিলে স্যারের সাথে কফি খেতে যাই "কয়লা রেস্টুরেন্টে"। সেখান থেকে ফিরে আমরা গেলাম স্যারকে নিয়ে ঘুরতে । আমায় আর নাভিদকে তো ২বার অটোরিক্সাও ঠেলতে হলো। আসলে যাত্রী বেশী হয়ে গিয়েছিল মনে হয়। কক্সবাজার শহরটা একটু ঘুরে দেখলাম আমরা। এরপর শুরু হয় আমাদের কাকড়া ফ্রাই খোজার মিশন। বেশ কয়েকটি ভাল মানের রেস্তোরা ঘুরে না পেয়ে অবশেষে সুগন্ধা বীচে আসলাম। ড. রোজ স্যার কাকড়া গুলো হাতে নিয়ে গন্ধ শুঁকে দেখছিলেন, ওনার বিশ্বস্ত নাকের সুবাদে আমরা ভাল কাকড়া গুলোই পাই। এরপর শুরু হয় অপেক্ষার পালা। মিনিট বিশেক পর আমাদের টেবিলে ফ্রাই হয়ে চলে আসে কাকড়াগুলো। আমি আস্তে আস্তে খাচ্ছিলাম কিন্তু স্যারের খাওয়া দেখে মনে হচ্ছিল স্যার অনেক পছন্দ করেন এইটা। এরপর আমরা চলে আসি হোটেলে। ডিনার সেরে সবাই সবার রুমে চলে যাই। পরেরদিন সকালে আমরা আবার সমুদ্র সৈকতে নামি। দুপুরে লাঞ্চ সেরে আমরা রওনা হই রামু বৌদ্ধ মন্দির দেখার জন্য। রামু কক্সবাজারের একটি উপজেলা। এখানে প্রায় ৩৫টি বৌদ্ধ মন্দির রয়েছে এর মধ্যে উত্তর মিঠাছড়ির পাহাড় চূড়ায় ১০০ ফুট লম্বা গৌতম বুদ্ধের সিংহ শয্যা মূর্তি দেখে থমকে দাড়াতে হয়। মূর্তিটি মন্দিরের ঠিক সামনেই অবস্থিত। জুতা খুলে সিড়ি দিয়ে উঠতে হয় মন্দিরে। অনেকের মতে এশিয়ার মধ্যে এটাই সর্ববৃহৎ বৌদ্ধ মূর্তি। সেখান থেকেই আমরা যাই রামু রাবার বাগানে। বাগানের সাথেই রাবার কারখানা অবস্থিত। আমরা যাওয়ার পর সেখানকার ম্যানেজার আমাদের রাবার গাছ থেকে আঠা সংগ্রহ থেকে শুরু করে সেটা দিয়ে রাবার তৈরির পুরো প্রক্রিয়াটি বুঝিয়ে দিলেন। সন্ধ্যা হয়ে আসছিল তাই আমাদের হোটেলে ফিরে আসতে হয়। এইদিন গ্রান্ড ডিনার। খাবার বেশ ভালো। রাত ১১.৩০ মিনিটে আমরা সমুদ্রের পাড়ে চলে যাই। সেখানে ফানুশ উড়িয়ে আমরা ইংরেজী নববর্ষকে বরণ করে নিই। আইসক্রিম খাওয়ালেন স্যার তারপর ভোর পর্যন্ত আমরা কয়েকজন স্যারের রুমে আড্ডা দিই। ঘুম থেকে উঠতে দেরি হওয়ার জন্য সকাল ১০ টায় নাস্তা সারতে হলো। সুগন্ধা বীচের মার্কেটে তারপর সমুদ্রের পাড়ে একটু ঘুরতে গেলাম। ১২ টায় হোটেলে চেক আউট তাই তাড়াতাড়ি ফিরতে হলো সেখান থেকে। ভাবতেই খারাপ লাগছিল যে চলে যেতে হচ্ছে এখান থেকে। সব মিলিয়ে একটি সফল শিক্ষা সফরের আয়োজন হয়েছিল কমিউনিটি মেডিসিন ডিপার্টমেন্ট (এঃগঈ) এর পক্ষ থেকে। আমরা পরের দিন সকাল ১১টায় কলেজ ক্যাম্পাসে ফিরে আসি।

আপেক্ষিকতা

Rakib Mahmud
Roll- 128
Batch- 8th

মনে করুন, আপনি আলোর গতিতে এমন করছেন। আপনার সামনে একটি আয়না রাখা আছে। আপনি কি আয়নায় নিজের অবয়ব দেখতে পাবেন? প্রশ্নটির উত্তর পরে দেই। ঠিক এক শতাব্দী আগে একই প্রশ্ন এসেছিল অজ্ঞাত কুলশীল এক কেরানীর মাথায়। তিনি ভেবেছিলেন, গ্যালিলিওর প্রিন্সিপাল অব রিলেটিভিটি (Principle of Relativity) যদি সত্য হয়ে থাকে তাহলে আয়নায় নিজের প্রতিবিম্ব কখনোই দেখা সম্ভব নয়। কারণ প্রিন্সিপাল অব রিলেটিভিটি অনুযায়ী কোনো বস্তু যদি অপর কোনো বস্তুর সাপেক্ষে সমবেগে চলতে থাকে তাহলে তার পক্ষে কখনোই বোঝা সম্ভব নয় যে তার অবস্থার পরিবর্তন ঘটছে কি ঘটছে না। যেমন, পৃথিবীর সাপেক্ষে আমাদের গতি শূন্য বলেই সূর্যের চারপাশে পৃথিবীর ঘূর্ণন কখনোই আমরা বুঝতে পারি না। কিন্তু বস্তু যদি আলোর গতিতে গতিশীল হয় তখন? পুরো ব্যাপারটাই অন্যরকম হয়ে যাবে। ভ্রমনকারী ব্যক্তি আয়নার দিকে তাকিয়ে নিজের অবয়ব কখনোই দেখতে পারেন না। কারন আলো তার সাপেক্ষে সম্পূর্ণ গতিহীন হয়ে যাবে। প্রতিফলিত হয়ে ভ্রমনকারীর চোখে পড়ার সময়টুকুও পাবে না। কিন্তু তখন প্রিন্সিপাল অব রিলেটিভিটি ভিত্তিহীন হয়ে পড়বে। অখ্যাত সেই কেরানী এ সময় অনুধাবন করেন প্রিন্সিপাল অব রিলেটিভিটি সার্বজনীন। এখানে কোনো ভুল নেই। আয়নায় নিজের অবয়ব দেখতে হলে আলোর গতিকে অন্যরকম ভাবতে হবে। তিনি অবশেষে বললেন আলোর গতি কখনোই তার উৎস বা পর্যবেক্ষকের গতির উপর নির্ভর করে না। এটা সবসময়ই ধ্রুবক। তিনি আরও বললেন আলোর গতীতে গতিশীল কোনো বস্তুর ক্ষেত্রে দৈর্ঘ্য শূন্য, এর অসীম ও সময় স্থির হয়ে যাবে। বিজ্ঞানীরা দৈর্ঘ্য, ভর ও সময়কে এতদিন পরম ভেবে এসেছিলেন। কিন্তু অজ্ঞাতকুলশীল সেই কেরানী সব আপেক্ষিক বানিয়ে ফেলেন। এটাই ছিল স্পেশাল রিলেটিভিটি (Special Relativity)।

বছর খানেক পরে তিনি একবার জ্বানালা দিয়ে বাহিরে তাকিয়ে ভাবলেন, "যদি ছাদ থেকে কেউ নিচে পড়ে যায় তখন কি হবে?" হাড়গোড় তো ভাঙবেই, কিন্তু পতনের আগমুহূর্তে? তিনি ভাবলেন পতনের আগমুহূর্তে পতিত ব্যক্তি কোনো ওজন অনুভব করবে না। এটা অনেকটা স্পেসে ওজনহীনতার মতো (Equivalence Principle)। তিনি বললেন কোনো আকর্ষন বল নয়। বরং প্রচন্ড ভর তার আশেপাশের স্থান কাল বাঁকিয়ে ফেলতে পারে। এতে বস্তুর গতিপথও বেঁকে যেতে পারে যেমন সূর্যের প্রচন্ড ভর তার চারপাশের স্থান কালকে বাঁকিয়ে ফেলে। সেই বক্রতলে আটকে পড়ে পৃথিবী সূর্যের চারদিকে আবর্তন করে। তিনি মহাকর্ষকে বিবেচনা করেছিলেন অ্যাপারেন্ট ফোর্স হিসেবে। যার উৎপত্তি সার্বজনীন (Universal law of gravitation) তত্ত্ব। অখ্যাত সেই কেরানীর পরিচয় নতুন করে দিতে হবে? আচ্ছা হিমালয়সম প্রতিভাবন এই মানুষটি ছিলেন আলবার্ট আইনস্টাইন (Albert Einstein)।

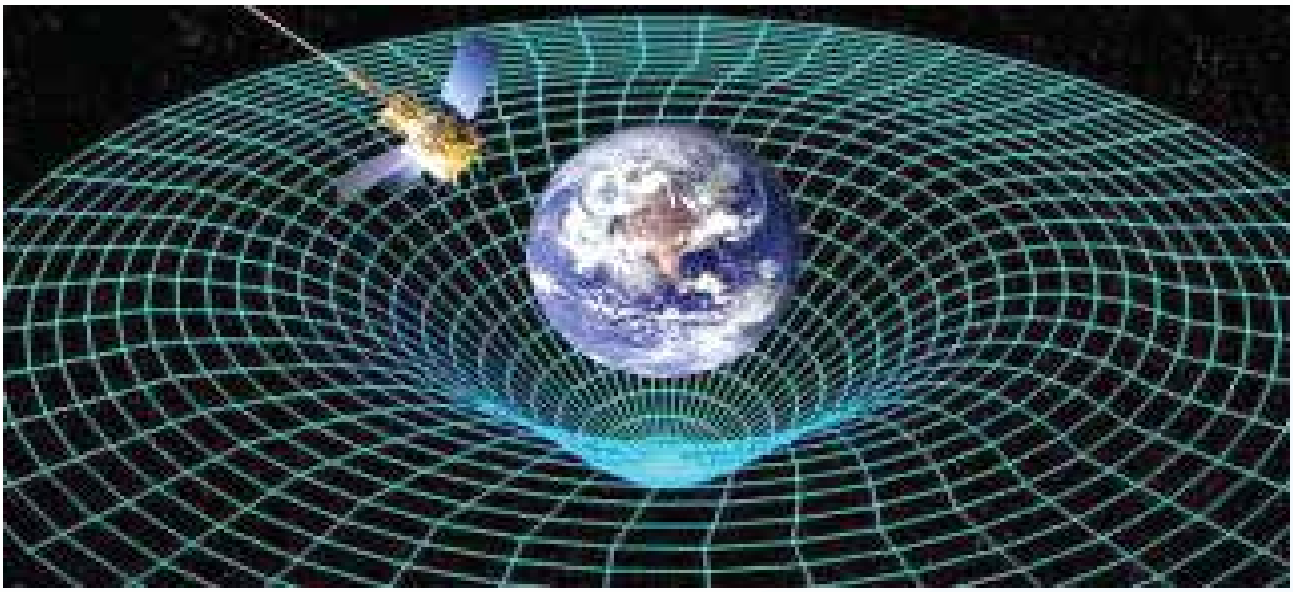

R.I.P হিউম্যানিটী

শাহরিয়ার শোহান
টিএমসি- ০৯

এ গল্প কোনোদিন লিখতে হবে সেটা জানতাম না। তবে পরিস্থীতি এমন যে লিখতে বাধ্য হলাম। তবে এটি গল্প নয়। এ এক কঠিন বাস্তবতা। মডার্ন কালের যুগে এক কুসংস্কারাচ্ছনের গল্প। কয়েক দিন আগে শুনেছিলাম পদ্মা সেতুর জন্য মাথা লাগবে বিষয়টা হাস্যকর শোনালেও এই গুজব যে কতটা ভয়ংকর হতে পারে সে ঘটনাই আজ বলব।

ত একবার বাসে করে বাড়ি যাচ্ছিলাম। ছোট উপজেলা শহরের বাস। আমার মত বড় মানুষ ঐ টুকু সীটে যেন ধরতে চায় না। বাসে উঠে পড়লাম, দেখলাম বাস ভর্তি মানুষ। প্রথমে ভাবলাম পরের বাসে যাব। পরে দেখলাম একদম শেষ সাড়িতে ১টি মাত্র সীট ফাকা আছে কিন্তু সেখানে বসা খুব মুশকিল। তবুও গেলাম সীটের কাছে। আশে পাশের সীটে কয়েকজন বসাও ছিল। কেউই একটু সড়তে চায় না, কেউ ভদ্রতাও দেখায় না। নেমে আসতে লেগেছিলাম তখন পেছন থেকে একজন কেউ ডাক দিল। দেখলাম ভদ্র লোকের পাশে একটি ছোট বাচ্চা। আমাকে ডেকে তিনি বসার জায়গা করে দিলেন। বাচ্চা টা কোলে নিয়ে তিনি জানালার পাশে সড়ে বসলেন। বিষয় টা আমার কাছে খুব ভাল লাগছিল। ভদ্রলোককে ধন্যবাদ দিলাম মনে মনে।

যাত্রা শুরু করলাম, কানে হেডফোন লাগিয়ে গান শুনতে শুরু করলাম। কিছুক্ষণ পরে দেখলাম কিছু একটা হট্টগোল বেধেছে। দেখলাম কিছু লোক জমা হয়ে গেছে আমার সামনে। হেডফোন টা খুললাম, কি হয়েছে সেটা বুঝার জন্য। দেখলাম আমার পাশে বসা বাচ্চাওয়ালা ভদ্রলোকটাকে ইনকুয়েরী করছে। বুঝলাম আমাদের বাঙালী জনতা তাদের দায়িত্ব পালন করছে। তার কারন আছে। পাশে বসা ভদ্রলোকটির পাশে বাচ্চা আছে সে অনেক কান্নাকাটি শুরু করেছে। বাচ্চাটি তার 'মা' এর কাছে যেতে চায়। বাচ্চাটাকে সবাই মিলে জিজ্ঞেস করলাম সে কি তোমার বাবা?

বাচ্চাটা মাথা নেড়ে জানায়-"না"।

ভদ্রলোক নিজেও বারবার বলেছেন উনি বাচ্চার বাবা না চাচা হন। বাচ্চার বাবা উনার সাথে বাচ্চাকে পাঠাইছে। সবাই মিলে জিজ্ঞেস করলাম " বাচ্চার বাবা কই?" উনি উত্তর করলেন বাচ্চার বাবা জরুরি কোন কাজে গেছে তার মেয়েকে নিয়ে আর মা'র কথা জানতে চাইলে সে শুধুই চেয়ে থাকে। কিছু বলতে পারে না। এরপর বাচ্চার নাম জিজ্ঞেস করা হল। উনি একটা নাম ও বললেন। এবার বাচ্চাটিকে প্রশ্ন করা হল- "বাবু তোমার নাম কি"?

বাচ্চাটি শুধু কাদে, কোন উত্তর দেয় না। সন্দেহের বাতিক মাথা চাড়া দিয়ে উঠল আমারও। উনাকে বললাম বাচ্চার বাবাকে ফোন দিন। সে চেষ্টা করল কিন্তু ফোন ঢুকল না। জনতা ক্ষেপেছে চরম হারে। অবস্থা বেগতিক দেখে তিনি জানালেন বাচ্চার মা হারিয়ে গেছে অন্য কারো সাথে তার বাবা তাকে খুজতে গেছে। এদিকে বাচ্চা কোন কথা বলে না শুধু কাঁদছে। আম জনতা রাগে লাল হয়ে গেছে। এক উৎসুক যুবক (হাতে ব্রেস লাইট এবং টোকাই টিশার্ট) দিয়ে দিল একটা জোড় থাপ্পড়। এখানে আমিও নিরুপায়। যে মানুষটি কিছুক্ষণ আগে আমাকে বসার জায়গা করে দিয়েছিল এখন আমিও তাকেই সন্দেহ করছি। লোকটি চরম ভয় পেয়ে বলল- দয়া করে আমাকে বিশ্বাস করেন, আমি মিথ্যা বলছিনা" আমি এবার একটু দায়িত্বশীল হয়ে বললাম- আপনারা একটু থামেন, ভদ্রলোককে বললাম হয় বাচ্চার বাবাকে ফোন দিন অথবা আপনার কোন আত্মীয় কে ডাকেন সামনের স্টোপেজ এ। এক ভয়ংকর পরিস্থিতীর সূত্রপাত হয়। সকলে ভাবছে যে বাচ্চার মাথা নিতে চায় "পদ্মা সেতুর কাজে বিক্রি করতে চায়।"

অবশেষে বাচ্চার বাবা এবং নানি ২জনের সাথে ফোনালাপ হল আম জনতার। আম জনতা এমন সিআইডি অথবা ডিবি অথবা বড় কোন গোয়েন্দা সংস্থার মত ইনভেস্টিগেশন করলেন। আম জনতা সব কিছুরই প্রমান পেলেন যে ভদ্রলোক এতক্ষণ যা বলেছেন সত্যই বলেছেন। তবে এতেও আমাদের দেশের প্রতিবাদী আম জনতা থেমে থাকেনি তারা পুলিশ ডাকলেন। পুলিশ এসে ভদ্রলোককে বাস থেকে নামাই নিয়ে গেল বাচ্চা সহ। অনেক উৎসুক জনতাও নেমে গেল তার সাথে।

আমি আর নামলাম না বাস থেকে। দূরের আকাশে সূর্যটা লাল রঙ ধারন করেছে। সন্ধ্যার ভাব ধরেছে চারিদিকে। বাসাই বাবা-মা অপেক্ষা করছে তাদের ছেলের জন্য। কয়েকদিন পরে ফেরার পথে শুনলাম- সে বাচ্চাটির নানি এসে বাচ্চাটিকে নিয়ে গেছে তার বাবার কাছে থেকে। মনে মনে হাসলাম বাচ্চাটির চাচার কথা ভেবে আর বললাম "বেচারা"। এ শুধু একটি বাস্তবতা নয় এরকম হাজারো বাস্তবতা লুকিয়ে আছে বাংলার বুকে। স্মার্ট ফোনের দুনিয়া আজো কুসংস্কারচ্ছন্ন মনোভাব এদেশের আম জনতার। তারা বাস্তবতার চেয়ে গুজবকে বেশি প্রাধান্য দেয়। এ দেশের আম জনতা অনেক প্রতিবাদী তাদের অনেক রাগ, ক্ষোভ। অন্যায় অপরাধের বিরুদ্ধে সোচ্চার তারা। তারা নিজেদের ব্যর্থতা, পরাধীনতার ক্ষোভ এভাবেই প্রকাশ করে যুগে যুগে। তাদের এ ক্ষোভ এতটাই যে একজন মা কেও ছেলে ধরা বলে মেরে ফেলতে দু বারও ভাবায় না। একি শুধুই পরিস্থিতির স্বীকার নাকি নিজেদের ব্যর্থতা পরাধীনতার ক্ষোভ অন্যের উপর উসুল করা তা আমি জানি না।

শখের ডাক্তার

Nafiur Jannat Nova
Roll:- 33 TMC-10

বড় হয়ে আমি কি হব!

এইটা তো আমি দুনিয়াতে চোখ খুলে যখন প্রথম চিৎকারটা দিয়েছি তখনই আব্বু ঠিক করে ফেলেছিলো। মেয়ের প্রথম কান্না শুনে তার মনে হয়েছিল, মেয়ের গলা নাকি রুনা লায়লার মত। যেহেতু আব্বু আমার রুনা লায়লার বিশাল ফ্যান, তাই সে ধরেই নিয়েছিলো তার মেয়ে বড় হয়ে বিরাট সঙ্গীত শিল্পি হবে। তাই তখনই আমি গান গাইতাম, সরি সরি মানে কান্না করতাম আরকি। সে সেইটার মধ্যেও আমার গানের গলা খুজে পেত। তো আব্বুর এত আশা আমার গান নিয়ে সেই জন্য স্কুলে ভর্তির আগেই নাম লেখায়ে অর্ডার দিয়ে হারমোনিয়াম, তবলা বানানো হল। আর রাখা হল ভীষন কড়া একজন ওস্তাদ। কিন্তু ফলাফল ভয়ানক। সে তো জানে না তার মেয়ের গান শেখার প্রতি বিন্দুমাত্র আগ্রহ ছিল না। আসলে এমন না যে আমি বেরসিক মানুষ, গান শুনিনা, গান আমার ভীষণ প্রিয়। কিন্তু রুনা লায়লা হতে না তার গান শুনতেই ভালো লাগে। কিন্তু ছোট থেকেই ফাঁকিবাজতো তাই খেলার প্রতি বেশি আগ্রহ। তাই বিকালবেলা সবার সাথে খেলার সময়টাতে, টেকো গানের স্যার আমাকে গান শিখাতে আসতো আমি তখন কিভাবে পালায়ে খেলতে যাবো তা শুধু ভাবতাম। স্যার আসলে ঘুমানোর ভান করে থাকতাম। আর চলে গেলেই দৌড় দিতাম খেলতে। একটা ব্যাপার দেখলাম সেটা হল, গান হোক বা পড়াশুনা যেই জিনিসটা বাবা-মায়ের পছন্দ তা আমার অপছন্দই হয়। তো যখন সেই কড়া নোট গুলো আমি কখনোই হারমোনিয়ামে তুলতে পারতাম না তখন অনেক গালি গালাজ শুনতে হত এমনকি স্যারের হাতে মার খাইতেও হয়েছে অনেক। এইটা আমার রুনা লায়লা না হওয়ার মানে গান শিখতে না চাওয়ার কারন। যখন বাবা দেখলো যে নাহ তার মেয়ের মধ্যে রুনা লায়লার মত আসলে কোনো গুন-ই নেই মানে আমিতো সুর করে একটা লাইন বলে রাস্তায় ফকিররা যেভাবে ভিক্ষা করে তাও পারি না তখন সে আমাকে গান শেখা থেকে অব্যহতি দিলো। আমিও হাফ ছেড়ে বাঁচলাম। আর তারপর আমি ভাবতে লাগলাম, আমাকে এমন কিছু হতে হবে যেটাতে আমি মানুষের উপর হুকুম চালাতে পারবো। তো তখনই বিটিভিতে একদিন বাংলা সিনেমা দেখতে যেয়ে নায়িকা শাবানাকে আবিষ্কার করলাম জজ হিসাবে। তখনই আমি বাসায় বলে দেই যে বড় হয়ে অর্ডার অর্ডার হব মানে অর্ডার অর্ডার-করবো আরকি (ছোট্ট আমি জজদের নাম অর্ডার অর্ডার-ই ভেবে ছিলাম)। কিন্তু কিছুদিন পর নায়িকা পপির পুলিশ হওয়া দেখে ভাবলাম আমাকে পুলিশ-ই হতে হবে। কি সুন্দর গুন্ডাদের ধরে ধরে জেলে দেয়। আমিও গুন্ডা গুলোকে পিটায়ে মানুষ করবো। একটা সময় পর মনে হল ধুর তার চেয়ে আমি নায়িকা হবো, তাহলে তো আমি চাইলে পুলিশ, ডাক্তার, জজ, ব্যারিস্টার সবই হতে পারবো। বহু দিন যাবত, এমন ইচ্ছা নিয়েই ছিলাম। মাঝে মাঝে এসব পরিবর্তন হয়ে হরেক রকম কিছু হত বৈকি। তার পর সে অনেক দিন পেরিয়ে গেছে, 'এইম ইন লাইফ' রচনা লিখতে হবে, সেখানে তো আর নায়িকা লেখা যায় না, তাই আরকি ডাক্তার-ই লিখতাম আর সবার মত বই পড়ে মুখস্থ করে আরকি।

'এইম ইন লাইফে' ডাক্তার লিখতে লিখতে একদিন সত্যি সত্যি ডাক্তার হওয়ার ইচ্ছা জাগলো। কিন্তু চেনা এক মেডিকেলের আপু যখন বললো মেডিকেলে অনেক পড়া। ফাঁকিবাজ আমি সাথে সাথেই ডাক্তার হওয়ার সমস্ত ইচ্ছা একেবারে বাদ দিয়ে দিলাম। ভুলেও ডাক্তার হওয়া যাবে না। আমি এত পড়তে পারবো না বাবা, এইসব রচনাতে এমনিই লিখি আরকি।

রচনা তো গেল মাঝে মাঝে কবিতা লেখার শখ ছিল। তাই শখের বসেই একদিন "ডাক্তার হতে চাই" এমন একটা কবিতা লিখে ফেলেছিলাম, আর সেইটাই পরে গেলো বাবার চোখে। আর তারপর রুনা লায়লাকে রেখে সে স্বপ্ন দেখতে লাগলো বাংলাদেশের কোন বড় ডাক্তারের মত তার মেয়ে বিশাল ডাক্তার হবে। কি জ্বালা! আব্বুকে বুঝাতেই পারলাম না আমিতো ওসব এমনিতেই লিখেছি। আমিতো বেশি পড়তে পারবো না। এসে গেল ভর্তি যুদ্ধ। আমার তখনও মেডিকেলে পড়ার ১%ও ইচ্ছা নাই, আব্বুর কথায় শুধু পরীক্ষা চান্সতো হলো না, হবেনা তা তো জানতাম। কিন্তু আমাকে তারা মেডিকেলে ছাড়া অন্য কোথাও পড়াবে না বলে জানায়ে দিল। কি এক গৃহযুদ্ধ টাইপ বেধে গেলো, সাদা এপ্রোনের প্রতি তখনও কোন মায়া জন্মায়ে ওঠেনি কিন্তু আমাকে তারা মেডিকেলেই দেখতে চায়। সেকেন্ড টাইম দিতে হল। সেকেন্ড টাইমের সময় হঠাৎ আবিষ্কার করলাম গায়িকা, নায়িকা কিংবা জজ, পুলিশ কিছুই না আমি সাদা এপ্রোনটাই চাই। কিভাবে কিভাবে জানি এই ডাক্তার পেশাটার প্রতি ভালোবাসা জন্মায়ে গেলো। চান্স এবারও যদিও হল না কিন্তু আল্লাহর রহমতে সাদা এপ্রোনটা ঠিকই গায়ে জড়াতে পারলাম। সে এক অসম্ভব ভালো লাগা। স্বপ্ন স্বপ্ন সব। প্রথম প্রথম ভাবছি কত কিছুই না হবে। আমি হয়তো ওসব কিছুই পারব না। ভীতু একটা মেয়ে আমি কিভাবে একটা মানুষের হাড় হাড্ডি নিয়া পড়বো। ভূত বিশ্বাস না করলেও ভূত নিয়ে অনেক গল্প পড়েছি। হোস্টেলে রাতের বেলা ভূত আসবে কিংবা ক্যাডভারটা উঠে বসবে। এমন অনেক ফ্যান্টাসি নিয়েই মেডিকেলে আসা। কিন্তু ওমা আসার পর তো এসব কিছুই হলো না। সেই যে ভয়ংকর আইটেম শুরু হল তার কাছে কিসের ভূত কিসের ক্যাডভার। আইটেম কার্ড, টার্মের চেয়ে ভয়ানক যে কিছুই লাগে না। এই করে প্রথম ফেজ পেরিয়ে এলাম। দ্বিতীয় ফেজে তো আরও প্যারা ওয়ার্ড আর সাথে এই কমিউনিটি, ফরেনসিকের আইটেম তবুও ওয়ার্ডে যেয়ে নিজেকে ডাক্তার ডাক্তার লাগে ভাব আলাদা। কিন্তু মাঝে মাঝে এত প্যারার জন্য মনে হয় বাবার কথা শুনে রুনা লায়লা কেন হলাম না। এত পড়তে তো হতো না। বা শাবানার মত জজ কিংবা নায়িকা ওসবইতো ভালো ছিল।

তবুও ভালো লাগে ওয়ার্ডে যেয়ে যখন মানুষের সাথে প্রথম প্রথম কথা বলছি। ভালোইতো নাইবা হলাম গায়িকা কিংবা নায়িকা সত্যিকারের নায়িকা বা নায়ক মানে রিয়াল হিরো তো ডাক্তাররাই। তা লোক যতই কথাই বলুক আর গালি দিক দিন শেষে আমরাই তো একটি জীবন বাঁচাতে প্রাণপনে চেষ্টা করি।

বাস্তবতা

Kamrun Naher
Roll- 25
Batch- 10th

তোমাকে যখন আমার ঘরে বিয়ে করে আনলাম তোমার বয়স তখন মাত্র বারো বছর। আর আমি কেবল ২০ (কুড়ি) তে পা দিয়েছি। প্রথম রাতেই তুমি আমাকে দেখে খাটের নিচে লুকিয়ে ছিলে।

মামনি কে ডেকে সে কি কান্না. . . . . .

আমার খুব হাসি পেয়েছিল সেদিন।

এরপর থেকে তুমি মামনির কাছে ঘুমাতে। মাঝে মাঝে তোমার জানালায় উকি দিতাম। চেয়ে দেখতাম বধুর মায়া ভরা মুখ।

সে দিন হয়তো বুঝতাম না। ভালোবাসা কি, শুধু তোমায় দেখে বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠতো।

তোমার মনে আছে?, বাড়ির প্রতিটা আম গাছে তুমি চড়ে বেড়াতে, আম পেড়ে মামনির কাছে জমা রাখতে। নেয়ার সময় কম হলে হাত পা গড়িয়ে কাঁদতে। তখন যে তোমায় কি অপরূপ লাগতো। সে সৌন্দর্য দেখতাম আর মুচকি হাসতাম। সে হাসি যদি তুমি দেখতে আর রক্ষা পেতাম না।

মনে আছে, তুমি মেলায় যাওয়ার জন্য বায়না ধরেছিলে, তোমায় কোলে করে মানুষের ভিড় ঠেলে মেলায় নিয়ে গেছিলাম। সামান্য কিছু চুড়ি, আর মাটির পুতুল পেয়ে কি যে, খুশি হয়েছিলে। হঠাৎ মা মারা গেলো, সারা বাড়িতে শোকের ছায়া। তুমিও নির্বাক। এই শোক যে বদলে দিলো তোমাকে। ধীরে ধীরে বুঝতে শিখলে আমি তোমার স্বামী, এটা তোমার শ্বশুর বাড়ি।

সবাইকে অবাক করে ধরলে সংসার এর হাল। আস্তে আস্তে মামনির শূন্যতা কাটিয়ে উঠলাম। সবাই মামনিকে ভুলতে পারলেও তুমি পারনি, আমার বুকে মুখ লুকিয়ে কাঁদতে।

মামনি বুঝি তোমায় চুপিচুপি তার পরের আশ্রায়ের ঠিকানা তোমায় দিয়ে গিয়েছে। বুঝতে পারি ছোট্ট তুমি আমাকে পড়তে পড়তে মুখস্থ করে ফেলেছো। আমার প্রত্যেকটা প্রয়োজনে তুমি মিশে গেলে।

কি করে পাগল? ! !

সেই ছোট্ট মেয়েটি আজ তিন সন্তানের মা। হঠাৎ আমাদের সুখের সংসার ভেঙ্গে দিলো সেই মানুষ খেকো কালাজ্বর। আমাকে শূণ্য করে চলে গেলে তুমি। রেখে গেলে হাজারো স্মৃতি। সারা বাড়ি স্মশান হয়ে গেল।

সবাই ভেঙ্গে পরলো। শুধু পারলাম না আমি। কারণ তোমাকে দেওয়া কথাগুলো তো আমায় রাখতে হবে। তুমি বলেছিলে, তুমি না থাকলেও তোমার সাধের সংসার যেন এমনি থাকে, জানো আজও প্রতিটা দেয়ালে তোমার গন্ধ লেগে আছে। আজও খুজতে চেষ্টা করি তোমার সে মুখ। শুধু ভেসে ওঠে তোমার ছোট্ট সে বধু সেজে থাকা ছবি।

তোমার মায়াভরা সে মুখ,

আমি বুড়ো হয়েছি, চুল পেকে গেছে। তুমি থাকলে হয়তো তোমারো চুলে পাক ধরতো। খুব দেখতে ইচ্ছে করে তোমাকে। আর হয়তো বেশি দেরি নেই। খুব তাড়াতাড়ি চলে আসবো তোমার কাছে। অপেক্ষা করো আমার জন্য।

আমার ভালোবাসা।,

আমার প্রিয় বধূ !!!

The Motherly Tree

Afia Jahin
Roll: 66 Group: H
TMC-11

Long ago there was a huge apple tree. A little boy loved to play with it. He loved to climb up the tree, loved to eat apple and take a nap under it's shadow. Time passed, the boy grew up. One day the boy came to the tree and the tree asked him, "Hi ! Come and play with me." The boy replied, " I'm not a kid, so I don't play around trees. I play with toys and I need some money to buy toys." The tree again said, " I don't have money but you can take all my apples and sell them. So you will get the money you need." The boy picked all of them and went away. He sold the apple and got money. He bought a lot of toys. But he didn't come back. The tree was was without the boy.

One day the boy again come and he had become a young man now. The tree was very happy to see him and said," Why are you looking sad?" I am feeling very lonely without you." The boy replied, " I don't have time and I have to work for building a house." The tree said, "You can take my branches and trunk and build your house." The boy become very happy and cut them all and went away. Again, the tree was alone. After a long time the boy came and he had become an old man and was looking sad. The tree asked him "Why are you sad?" I wish I can help you. But I don't have apples and branches, even I don't have shadow. Nothing to offer you." The boy (now old) replied, "I'm tired of my life. I'm alone. I just need you. Can I sit down at your root? The tree replied, " Obviously ! Why not?" Then both were happy. So, we can say that tree is like our mother. We love to play with her when we are kids. We leave her alone and come only when we are in need. No matter that our mother will always give everything. She has to make us happy. So we should love our mother and shouldn't forget her. She will be happy by seeing us happy.

অনুভূতি

Sharmistha Malakar

Roll- 43 Batch- 11th

সন্ধ্যা আটটা। হসপিটাল থেকে ফোন এল। "স্যার, ইমারজেন্সী" কোন মতে রেডি হয়ে বেরিয়ে পড়লাম। শীতের রাত। আজ বুঝি শীতটা আরো জাঁকিয়ে বসেছে। কুয়াশার চাদরে মোড়া চারপাশ আর এখান থেকেই শুরু আমার অনুভূতির গল্প-------

ফোনেই রোগীর হিস্ট্রি নিয়ে নিলাম। কেসটা নিয়ে বাসে বসেই স্টাডি করছিলাম। হঠাৎ জানালার বাইরে চেয়ে দেখি ১০/১২ বছরের একছেলে..... এই কনকনে শীতে যার সম্বল কেবল একটা ফুলহাতা শার্ট আর ছেঁড়া প্যান্ট। অথচ সেদিকে তার খেয়াল নেই। প্রগাঢ় দৃষ্টিতে সে চেয়ে আছে বইয়ের উপর। ল্যাম্পপোস্টের আলো তার বই পড়ার আগ্রহকে ম্লান করতে পারেনি। বেধে দিতে পারেনি তার অদম্য ইচ্ছাশক্তিকে। অবাক হলাম.... কি নিষ্ঠুর আমাদের এই পৃথিবী আর পৃথিবীর মানুষ। কোথায় আমাদের মানবতা? তবে কি মনুষ্যত্ব চাপা পড়ে গেছে টাকার নেশায়। খটকা লাগল, দার্শনিক হয়ে গেলাম নাকি!!!

হসপিটাল গিয়ে দেখী রোগীর ইমিডিয়েটলি সার্জারী প্রয়োজন। সার্জারী শেষ করতেই ১টা বেজে পার হয়ে গেল। রাতটা হসপিটালেই কাটিয়ে দিলাম.... এইতো আমাদের জীবন! পরদিন সন্ধ্যায় রীতিমতো হসপিটালে যাচ্ছি। আগন্তুক সেই ছেলেটিকে চোখে পরল। কি মনে করে নেমে পড়লাম বাস থেকে .... ওর কাছে গিয়ে বললাম, "তোমার নাম কি? উত্তরে বলল, " স্যার রাজু"। বেশ! কথায় কথায় জানাল কাছেই একটা বস্তির চালাঘরে মাকে নিয়ে থাকে সে। সারাদিন সে টোকাই এর কাজ করে আর তাতেই কখনও আধপেট কিংবা উপোস দিয়ে চলে তাদের। কিন্তু তার পড়ার প্রতি আগ্রহ আমায় মুগ্ধ করল। ব্যাগ থেকে ওকে কিছু কলম, প্যাড বের করে দিলাম .... খুশিতে সে কেঁদে ফেলল। পা ছুঁয়ে বলল, "স্যার আমাগো কেউ দ্যাহেনা। আপনে অনেক ভালো." চোখের কোনে জল এসে গেল।

কি ভেবে হসপিটালে সাফিনকে ফোন দিয়ে বললাম, আমার ডিউটিটা একটু দেখে নে, আমার যেতে দেরি হবে। হয়ত সেই মুহূর্তটাকে আমি হারাতে চাইনি। রাজুকে নিয়ে লাইব্রেরীতে গেলাম। ওর পছন্দমতো বই, রং- পেন্সিল কিনে দিলাম। ওর অশ্রুসিক্ত চোখের চাহনি যেন আমার অনুভূতিকে দ্বিগুণ বাড়িয়ে দিল। ফিরতেই রাজুর মায়ের সাথে দেখা----ওনাকে আমার ফোন নম্বরটা দিয়ে বললাম যেকোন প্রয়োজনে আমায় জানাবেন----আমি আমার সাধ্যমত চেষ্টা করব।

আমার মধ্যে অন্যরকম একটা ভালো লাগা কাজ করতে লাগল। আর সেই ভালোলাগাটুকুকে সঙ্গী করেই ফিরে এলাম আমার চিরচেনা হসপিটালে। সেখানেও আমার কর্তব্য একজন মানুষ, একজন মা, কিংবা একটা পরিবারের মুখে হাসি ফোটানো। নতুন উদ্যমে মনোনিবেশ করলাম আমার সেবাব্রতে আর আমার ক্ষণিকের সেই অনুভূতি হয়ত ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব না----- হয়ত এই পৃথিবীর বহু মূলবান কিছু দিয়েও সেই অনুভূতিকে অনুভব করা যায় না; হয়তবা সেই রোমাঞ্চকর অনুভূতি কেবল রাজুদের অশ্রুসিক্ত চোখের চাহনিই সৃষ্টি করতে পারে, যার সান্নিধ্য পাওয়াও বুঝি ভাগ্যের------অর্জনের-----!

Story Behind a Life

Uporna Ahnaf
Roll- 63 Batch- 11

It is the story behind that life which I had always desired for. This life constitute memories, moments, emotions, pains, anxiety and ultimately these all brings lifetime happiness lifetime achievement.

Yes, I am telling about medical life. Not everyone get the opportunity of having experience about this life. I had got the golden key for opening the door of this life on 27.12.2018. That moment still makes me compelled to be emotional. That day of entered 'TMSS Medical College' for the first time and that moment was very much special as that was full of joy and anxiety.

I was starring at those while aproan wearing people and was thinking. 'Yes, they are our future. In the meantime. I was able to see myself in them as others future.

'DOCTOR' This small word holds such a big meaning right? Can we imagine just for once, that those who have got this word as a blessing, has the ability to change life.

On the day of my getting admitted to this college. I had made up my mind from the very moment that Yes. TMSS Medical College is that ladder for the journey of my new life which will take me on the top floor and will help me to build my future.

So, I would like to say, all the doctors who have put your footsteps in this golden field, please go ahead and carry all your responsibilities related to this life.

I feel proud of having the experience of leading this life.

জ্বলে ওঠো হে তরুণ

মোঃ আবু সালেক
রোল ৬১

একটি গাছে অনেক পাতা থাকে। অসংখ্যা সবুজ পাতা গাছের সৌন্দর্য বাড়িয়ে দেয়। সেই সৌন্দর্য দেখে সবাই মুগ্ধ হয়। তবে অসংখ্য সবুজ পাতার মাঝে অনেক পাতাই মাঝে মাঝে শুকিয়ে যায়। একসময় সেই শুকনো পাতাগুলো গাছ থেকে ঝরে মাটিতে পড়ে যায়। তখন সেই ঝরা পাতাকে আর কেউ মূল্য দেয় না। মানুষের জীবনও একটা গাছের মতো। সেই গাছেও সবুজ পাতার মতো সৌন্দর্য থাকে। সেই সৌন্দর্য হলো অসংখ্যা সাফল্যের পালক। মানুষের জীবন যখন সাফল্যের পালক দিয়ে ঢাকা থাকে, তখন তাকে সবাই সবুজ পাতার মতো ভাবে। আর যখন সাফল্যের পালক জীবন থেকে একটা ছিড়ে যায়, তখন সেই মানুষটিকে সবাই ঝরা পাতার মতো মনে করে। তার জীবনে যেন আর কোনো মূল্য নেই!

সত্যিই কি ব্যর্থ হওয়া মানুষগুলোর জীবন গাছের ঝরা পাতার মতোই মূল্যহীন? বনের ঝরা পাতাও কিন্তু অন্যের উপকার করে। বনের হিংস্র বাঘ যখন নিরীহ হরিণ শিকারের জন্য তীব্র বেগে ধেয়ে আসে, তখন শুকনো পাতাগুলো বাঘের পায়ের নিচে পড়ে মড়মড় আওয়াজ করে। সেই আওয়াজ শুনেই হরিণেরা বুঝতে পারে বিপদ আসন্ন। এভাবেই শুকনো পাতারা নিরীহ হরিণকে বিপদ থেকে মুক্ত করতে সাহয্য করে।

আমরা যারা তরূন মাঝি, আমরা জীবনের অনেক ক্ষেত্রেই ব্যর্থ হই - সাপ্লি, পেন্ডিং-- তাই বলে কি সবসময় বিষন্ন হয়ে বসে থেকে হাল ছেড়ে দেব? গাছের ঝরা পাতা গুলোর দেহে প্রাণ থাকে না, তবুও তারা অন্যের উপকারে আসে। আমাদের দেহে তো প্রাণ আছে, তবে আমরা কেন পারব না? জীবনে চলার পথে কষ্ট আসবেই। শুধু সাপ্লি কিংবা পেন্ডিং নয়, নানান ডিজাইনের কষ্ট। তারপরও কষ্টের নদী পাড়ি দিতে হবে। কখনো যদি খুব হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েন, তবে মাঝে মাঝে গাছের ঝরা পাতা গুলোর কাছে যাবেন। দেখবেন তারা আপনাকে সাহস দিয়ে বলবে, "তোমার জীবনে কিছুই হারিয়ে যাই নি। তোমার দেহে তো এখনো প্রাণ আছে। জেগে ওঠো! জ্বলে ওঠো হে তরুণ।"

Labyrinth

Mushtabsira Alam

Roll- 40 Batch- 11

The title of my story should be "Once upon a time in Mahasthangarh". Who does n't know about this place! But in my case, this place is related with so many memories; memories that I' II cherish for a lifetime. How can I forget that evenful adventurous day! I am not from Bogura. It takes about 4 to 5 hour to come to this place for, my hometown. But still it is the nearest histological place. So throughout my childhood I wanted to visit Mohasthangarh, I wanted to see those walls about which I have read so much in books. But when I got admitted to TMSS Medical College, there was always something or other happening around us & we wouldn't visit this place. It takes only about ten to fifteen minutes but still it took six month for us to plan to visit this place. Here begins my story of a day to remember. Definitely it was a Thursday, because in our medical life. Thursday is not only a day it is like Eid Day. There are no items or tutorial or lecture class & plenty of time to sleep.. On such a beautiful sunny Thursday our 10 minutes journey to Mahasthangarh began. All of us were so excited, so decked up. But the irongan us… Within about 15 minutes the sky was so cloudy, it was dark all around. But we were so concerned in our walking to not to trip over the wall that none of us noticed the sky. It didn't come to our mind a mid aged genuine farmer forbid us to go further, that what we will do if there is any storm or it rains heavily. Till day I thank that couple. At that time We were middle of a place with no people or house or anything present around. Mohasthangarh felt like a labyrinth. Then comes the most interesting part, How to get down from such a high wall of Mohasthangarh without breaking any bones of our body. But somehow we became spider woman & got down from that wall. Again there was no auto or CNG or rickshaws We were left nothing but our fear and a lonesome read & cornfield all around us. The just little shanshine in a gloomy day our savior 'Mama' will his van came!!!

I never felt so relived as much as I felt that time. When we all finally reached our hostel within thirty minutes of going out becoming wringing wet.

In brief that was our visit to Mohasthangarh. It was only 30 minutes, may be not such a big even, but for me it was a day that made me realize that every minutes matter that these samall things matter the most the mid aged couple who warred us not to go further, that ;mama' who took us to mohasthan Bazar, The world is still so beautiful because of these people who help others without expecting anything in return. One more thing makes me happy thinking about that day; the way we were giving courage to each other inspite of being afraid inside. This togetherness, these little adventures make life so much more beautiful. I couldn't see the entire Mohasthangarh, but I am still s grateful for that day & I hope that kind of beautiful dangerous day may come to everyone's life. Let us all live a life that will make us happy & give us reasons to laugh when we become old. so,

'Let Chaos Storm!

Let cloud swarm!

Let wait for form….''

সেল নং-৩৯

মাফিক আল-আমিন

রোল- ৩৯ ব্যাচ-১১

আমি অদ্ভুদ এক বাসায় থাকি। আসলে বাসাটা ঠিক অদ্ভুদ না, বাসার ভেতরের মানুষগুলো মানে আমার পরিবারের মানুষগুলা অ দ্ভুদ। কেউ কারো সাথে কথা বলে না, একমাত্র আমার সাথে বাদে। শুরুতে কিন্তু এরকম ছিল না। আমি যে দিন TMSS মেডিকেল কলেজ এ ১ম বর্ষ ভর্তি হলাম সেদিন পর্যন্ত সব ঠিকঠাক ছিল। এরপর সবাই কেনো জানি ভীষণ রকম বদলে গেলো।

যাই হোক, আমি হচ্ছি পরিবারের ছোট ছেলে, তাই আদর একটু বেশিই পাই। এই যেমন আজ ঘুম থেকে সকালে উঠে খাবার টেবিলে যেতেই আম্মু মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে গেলো। এরপর আপু খাইয়ে দিল মুখে তুলে। এতবড় ছেলেকে কেউ খাইয়ে দেয়, বলুন? অবশ্য আমার ভালোই লাগে। এরপর নিজের রুমে ঢুকে ফুল ভলিউমে গান দিয়ে নিক পিরোগের বেস্টসেলার থ্রিলার উপন্যাস। "৩ অ.গ" পড়া শুরু করলাম। বইয়ের প্রধান চরিত্র 'হ্যানরি বিনস্'। এই ব্যাটা জন্ম থেকে বর্তমান ৩০ বছর পর্যন্ত প্রতিদিন রাত ৩টায় জেগে ওঠে আর এক ঘন্টা পর মানে ৪ টায় আবার ঘুমিয়ে যায়। এইভাবে প্রতিদিন ২৩ ঘন্টা ঘুমায় আর ১ ঘন্টা জেগে থাকে। এই ১ ঘন্টাতেই তার সব দুঃসাহসিক কাজকারবার নিয়ে বইটা। যা হোক খুব মনোযোগ দিয়ে পড়ছিলাম বইটা এমন সময়, ভাইয়া রুমে ঢুকলো। অফিসে যাচ্ছে তাই জানিয়ে গেলো (হাতে কচকচে ৫০ টাকার একটা নোটও ধরিয়ে দিল, প্রতিদিনের রুটিন)। আবার পড়া শুরু করলাম। কখন যে, দুপুর হল বুঝলাম -ই না। এবেলা আম্মু ভাত খাইয়ে দেয়, মুরগীর ঝোল দিয়ে। আমি মাছ খাই না, গন্ধ লাগে। খাবার শেষ করে রুমে ঢুকেই বিছানায় গা এলিয়ে দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে ঘুম।

বিকালে ঘুম ভাঙলো ফোনের শব্দে। নুঝাত ফোন দিয়েছে, নুঝাত আমার --- থাক বললাম না। লজ্জা লাগছে, বুঝতেই তো পারছেন। ও নাকি আমাদের বাসার এদিকে এসেছে। পার্কে আছে এখন, দেখা করতে বলল। বেছে বেছে সবচেয়ে সুন্দর শার্টটা পড়লাম। সাদার মাঝে কল্কের নকশা কাটা। নুঝাত নিজেই গিফট করেছিল। বডি স্প্রে মেখে, চুল আচড়ে দরজার সামনে চলে আসলাম। "আম্মু, আপু, আমি বাইরে থেকে ঘুরে আসছি, "জোর গলায় বললাম বাসায় অন্দর মহলের উদ্দেশ্যে। কিন্তু কোন জবাব আসলো না অদ্ভুদ তো! দুইজনেরই "আচ্ছা সাবধানে থাকিস," বলার কথা কিন্তু সেরকম টা হল না। অন্যসময় হলে ভেতরে গিয়ে দেখতাম, কিন্তু আজ তাড়া আছে (বুঝতেই তো পারছেন---)। দরজা খোলার সাথে সাথে অবাক হয়ে গেলাম। বাইরের কলাস্পিবল গেট এ তালা দেওয়া। রক্ত চড়ে গেলো মাথায়। আজকেই এমনটা হতে হলো। দুড়দাড় করে আম্মুর ঘরে গেলাম, কিন্তু আম্মু নেই সেখানে। অদ্ভুদ, এই সময়ে আম্মু রেস্ট নেয় প্রতিদিন। ওয়ার্ড্রোবের ১ম ড্রয়ারটা। চোখ ছিটকে বেরিয়ে আসার জোগাড় হলো। চাবি নেই, তার বদলে সেখানে সাদা রঙের একটা চিরকুট। লেখা- বাইরে যাওয়া নিষেধ। মানে কি! আপুর রুমে গেলাম। সেও নেই ঘরে। কিন্তু তার বিছানার উপর একটা চিরকুট। "বাইরে যাওয়া নিষেধ।" ফাজলমো হচ্ছে আমার সাথে। ছুটে গিয়ে লাথি দিলাম গেটে। লোহার গেট, তাই ব্যথাটা আমিই পেলাম। নিষেধ মানে। আমাকে বাইরে যেতে দেবে না। দরকার হলে গেট ভেঙে ফেলবো। অনেক্ষণ লাথি দিলাম, কাজ হলো না। একটা ঔষধ অবশ্য আছে। সেটাই কাজে লাগালাম। নিজের মাথা দিয়ে গুঁতো দিতে লাগলাম গেটে। এবার নিশ্চই গেট না খুলে পারবে না। কিন্তু কেউ এলো না। রক্তে ভিজে যাচ্ছে গেট, আমার কপাল। থামলাম না, গুঁতো দিতেই থাকলাম, খুলবে না মানে!

---৩৯ নাম্বার সেলের পেশেন্ট আবারো পাগলামো শুরু করেছিল স্যার।

---আবার সেই আগের কাহিনী?

---হ্যাঁ, একা একা সারাদিন কথা, দেয়ালে মাথা দিয়ে গুঁতো। রক্ত টক্ত দিয়ে একাকার।

--এবার তো ভেবেছিলাম ঔষধে কাজ হচ্ছে।

--এ কদিনের ব্যবহারে তো সেরকমই মনে হয়েছিল। কিছু করার নেই স্যার, আগের মতই----

---বেঁধে রাখতে চাইছো?

---এছাড়া আর কোন উপায় আছে স্যার?

---ছেলেটার ফ্যামিলি হিস্ট্রি তো জানো? অ্যাক্সিডেন্টে পরিবারের সবাই মারা যায়। এই মেডিকেল কলেজ এ ভর্তি করার পর পরিবারের সবাই বাড়ি ফিরছিল। কিন্তু এক্সিডেন্ট এ সবাই মারা যায় শুধু ছেলেটা কেমন কের যেনো বেঁচে গেলো। কিন্তু তারপর থেকেই তো-------

---সবই জানি স্যার। ছেলেটার ব্যাচমেটরা এখনো উপরের ফ্লোরে এনাটমি ক্লাস করতেছে আর সে নিচতলায় মেন্টাল হসপিটালে। কিন্তু এরকম চলতে থাকলে ছেলেটা নিজেও তো মারা যাবে। তাই বেঁধে রাখতেই হবে স্যার।

--আচ্ছা, যা ভালো মনে হয় করো।

চেতনায় বঙ্গবন্ধু

মোছাঃ রোখসানা পারভীন
৩য় বর্ষ, শিক্ষাবর্ষঃ ২০১৯-২০২০, রোল-৪১

"যতকাল রবে পদ্মা, মেঘনা, গৌরী, যমুনা বহমান, ততকাল রবে কীর্তি তোমার শেখ মুজিবুর রহমান
দিকে দিকে আজ অশ্রুগঙ্গা রক্তগঙ্গা বহমান, তবু নাই ভয় হবে হবে জয়, জয় মুজিবুর রহমান"

১৯২০ সালের ১৭ ই মার্চ জাতির এই মহানায়ক, হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়ায় এক সমভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। মার্চ মাসকে আমরা বলি অগ্নিঝরা মার্চ। মার্চ মাসে অগ্নি ঝরেছিল কি না তা আমরা দেখিনি। কিন্তু ১৯২০ সালের ১৭ ই মার্চ টুঙ্গিপাড়ায় এক আগুনের ফুলকি জন্মগ্রহণ করেছিল।

১৯৪৭ এ পাকিস্থান হওয়ার পর, পাকিস্থানি মোহে আচ্ছন্ন যখন বাঙ্গালী মুসলমান এমনকি তাদের নেতৃবৃন্দ সেই সময় এক তরুন বেকার হোস্টেলে বসে তার কিছু সাথিদের নিয়ে ছোট্ট একটি সভা করলেন বলে দিলেন এই পাকিস্থান বাঙ্গালির অধিকার রক্ষা করবেন না। সেই শুরু মহানায়কের জন্মের। ইতিহাসের নায়ক হওয়ার মত যোগ্যতাসম্পন্ন মানুষ সব কালে, সব যুগে সৃষ্টি হয় না। যুগ যুগান্তরের পরিক্রমায় হাতে গোনা এক আধজনই শুধু ইতিহাসের নায়ক হতে পারেন। ইতিহাস তার আপন তাগিদেই নায়কদের উদ্ভব ঘটায়, আর সেই নায়কই হয়ে ওঠেন ইতিহাস রচনার প্রধান কারিগর ও স্থপতি। বঙ্গবন্ধু ছিলেন তেমনই একজন কালজয়ী পুরুষ। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শুধু একটি নাম নয়, একটি ইতিহাস। যে ইতিহাস রচনা করেছে হাজার বছরের শৃঙ্খল মোচনের এক অমর মহাকাব্য। তিনি প্রজ্জলিত এক নক্ষত্র, অগনিত মানুষের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার এক প্রস্ফুটিত গোলাপ। বাঙ্গালি বিশ্বের যেখানেই থাকুক না কেন, তার আত্মপরিচয়ের ঠিকানা, অহঙ্কারের সাতকাহন, আত্মমর্যাদার প্রতীক- জাতির জনক শেখ মুজিব। বঙ্গবন্ধু বাঙ্গালির চেতনার মুকুটহীন রাজা, অপ্রতিদ্বন্দী, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী। বঙ্গবন্ধুর প্রবল ব্যক্তিত্ব ছিল হিমালয়ের চেয়েও বিশাল। সে ব্যক্তিত্বের সামনে মাথানত করতে হয়েছিল প্রবল প্রতাপশালী পাক জেনারেলদেরও। তাইতো কিউবার অবিসংবাদিত বিপ্লবী নেতা ফিদেল কাস্ট্রো বলেছিলেন,

"আমি হিমালয় দেখিনি, শেখ মুজিবকে দেখেছি"

ভাষা আন্দোলন থেকে ধাপে ধাপে স্বাধীনতা অর্জনের সোপানগুলি যে কত বন্ধুর পথ অতিক্রম করে এগুতে হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। স্বাধীন বাংলাদেশ ও স্বাধীন জাতি হিসেবে মর্যাদা বাঙালি পেয়েছে যে সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে, সেই সংগ্রামে অনেক ব্যথা-বেদনা, অশ্রু ও রক্তের ইতিহাস রয়েছে। মহান ত্যাগের মাধ্যমে মহৎ অর্জন করে দিয়ে গেছেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চের তার সেই কালজয়ী ভাষণ বাঙ্গালী

জাতিকে আজো উজ্জীবিত করে। এখনো যখনই শুনি ''রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দেব, তবু এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো, ইনশাল্লাহ, তখনি মনে হয় আর একবার যুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়ি। এদেশ থেকে যত অন্যায় দুর্নীতি আছে তা মুছে ফেলি চিরতরে।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর সেই প্রত্যয়ে স্বাধীন হয়েছিল বাংলাদেশ। পেয়েছিল নতুন এক মানচিত্র। শুধু যুদ্ধক্ষেত্রেই নয় সবক্ষেত্রেই বিচরণ ছিল বঙ্গবন্ধুর। বিশেস করে আমাদের চিকিৎসক সমাজের দারুন বিপ্লব ঘটিয়েছিলেন তিনি। স্বাধীনতা উত্তর বঙ্গবন্ধু জনগণের মৌলিক অধিকার চিকিৎসাকে সুশিক্ষিত ও সহজলভ্য করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ হিসেবে চিকিৎসকদের ১ম শ্রেণীতে উন্নীতকরণ, ইনসার্ভিস ট্রেনিং প্রথা প্রবর্তন, থানা স্বাস্থ্য প্রকল্প গঠন ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ সহ অন্যান্য প্রকল্প গঠনের মাধ্যমে যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। পরবর্তীতে বঙ্গবন্ধু কন্যা ১৯৯৬ সালে দায়িত্ব গ্রহণের পরপরই ১৯৯৭ সালের ৩১ শে জুলাই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সরকারী আদেশ প্রদান করেন যার কার্যক্রম শুরু হয় ১৯৯৮ সালের ৩০ শে এপ্রিল। এই বিশ্ববিদ্যালয় উচ্চ মেডিকেল শিক্ষা, সেবা এবং গবেষণায় বিশ্ব সেরা তালিকাভূক্ত হয়েছে। আমরা উচ্চশিক্ষার সুযোগ পাচ্ছি।

পরিশেষে একটি কথাই বলতে চাই, হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর কালজয়ী নীতি, আদর্শ, চেতনাকে বুকে লালন করে আমরা বাংলাদেশকে সমৃদ্ধির পথে আরো একধাপ এগিয়ে নেওয়ার দৃঢ় সংকল্প ব্যক্ত করছি।

লকডাউন

(করোনা শুরুর প্রারম্ভে লেখা কবিতা)

অধ্যাপক ডাঃ মোঃ রফিকুল ইসলাম
অধ্যক্ষ (অবসরপ্রাপ্ত)
অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, শিশু বিভাগ
টিএমএসএস মেডিকেল কলেজ, বগুড়া।

কহিলা রাজা হবু শোন গো গবু রায়
কালিকে আমি ভেবেছি সারা রাত্র,
করোনা কেমনে দেহে আসে যায়
ঘরের বাহিরে শ্বাস নেওয়া মাত্র।

তোমাদের বেতনে ব্যয় টাকা কোটি কোটি
মাসের পর মাস ভোগ করো সপ্তাহে দুটো ছুটি
স্বাস্থ্য খাতে তোমাদের নাহি ছিলো দৃষ্টি
রাজ্যে মোর একি হলো অনাসৃষ্টি।

বৈশিক করোনার ছোবলে আক্রান্ত রাশি রাশি
কেমনে মরছে মানুষ বিশ্বব্যাপি সামান্য সর্দি কাশি।
শীঘ্রই এই করোনার করবে প্রতিকার,
নহিলে বিশ্বব্রম্মান্ডে কারো রক্ষা নাহি আর।

শুনিয়া গবু মন্ত্রী পরিষদ ভাবিয়া হলো খুন
দারুণ ত্রাসে ঘর্ম বহে সারা গাত্রে,
গঠিত জাতীয় পরামর্শ কমিটির হইল মুখ চুন
মন্ত্রী পরিষদসহ উপদেষ্টামন্ডলীর নিদ্রা নাহি রাত্রে।

রান্না ঘরে চলছে না কারো হাড়ি
নাওয়া খাওয়া সবাই দিলো ছাড়ি
অশ্রু জলে ভাসালো কেউ বা পাকা দাঁড়ি
কহিলা মন্ত্রী পরিষদ হবু রাজার পাদ পাদ্মে
হাঁচি কাশিতে করোনা নাকে মুখে যদি ছড়ায়
কেমনে শ্বাস প্রশ্বাস নেব মোরা এই ধরায়।
জাতীয় পরামর্শ কমিটি জরুরী বৈঠকে বসিলো
বিশ্বস্বাস্থ্যসহ মহারথীদের সিদ্ধান্ত হলো
চলবে লকডাউন বিশ্বজুড়ে সব কিছু যেন এলোমেলো
মিল কারখানা সব বন্ধ চলবে না কোন গাড়ি
বন্ধ হলো দোকান পাট দলে দলে শ্রমিকেরা ছুটিলো বাড়ি
লকডাউনের নামে করিতে সামাজিক দুরত্ব দুর
সারা বিশ্বজুড়ে হলো করোনায় ভরপুর।

বিদেশে যত ছিলো শ্রমিক দলে দলে দেশে ফিরে এলো
মানলো না কোয়ারান্টাইন করোনা বিশ্বজুড়ে ছড়ালো।
কুলি দিনমজুর মুটে কোথাও কাজ নাহি জোটে
ঘরে ছেলে মেয়ে নিয়ে অনাহারে দিন কাটে।
চারিদিকে হাহাকার আজি জীবন জীবিকার খোঁজে
লকডাউন করোনায় মৃত্যু ঝুঁকি তারা নাহি বোঝে।
রাস্তায় নেমে পড়ে সবাই পেটে খাবার নাহি
মহাসড়ক অবরোধ গার্মেন্টস শ্রমিকের মাসিক বেতন চাহি।

আবার মন্ত্রী পরিষদ ডাকিলো পরামর্শে
বসিলো পুন যতেক গুন বন্ত
ঘুরিয়ে মাথা হেরিলো চোখে সর্ষে
খেপিছে অনাহারে জনগন হায় নাহিক পায় অন্ত।
বিশ্ব জুড়ে লাখো লাখো মানুষ করোনায় মরে
করোনা চিকিৎসায় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ব্যবস্থাপত্র যেন নড়বড়ে।
এফডিও এর ঘন ঘন সিদ্ধান্ত বদল চলে
কখনো ক্লোরোকুইন কখনো রেমডিসিভির এর কথা বলে।

অবশেষে সিদ্ধান্ত এলো দেশ কিংবা বিশ্ব জুড়ে
লকডাউন নহে
নাকে মুখে চোখে লকডাইনের মাঝে নিজের সুরক্ষা তবে কহে।
সীমিত আকারে চলবে বাস যাত্রী বাহি
খুলবে দোকান পাট স্বাস্থ্য বিধি মেনে ভয় কভু নাহি
সবাই নিরাপদ দুরত্ব বজায় রেখে
চোখ মুখ করো লকডাউন মাস্ক চশমা চোখ দিয়ে
করোনা মুক্ত করো স্যানিটাইজার সাবানে হাত ধুয়ে।

আসুন করোনার সাথে সহ অবস্থানে করি বসবাস
দুর করি দেই সকল ভয়ভীতি নহে আর দীর্ঘশ্বাস।
দু'হাত তুলো খোদার কাছে তওবা করো হে মোমিন
ক্ষমা করে দাও মোরা গুনাগার ওহে রব্বুল আলামীন।

মেডিকেল সমাচার

ডা. আব্দুল্লাহ্ আল আহসান (আরিফ)
লেকচারার (ফার্মাকোলজী)

1st Prof

যখন আসলাম আমি মেডিকেল কলেজে
পড়লাম অথৈ সমুদ্রে, পড়া কিছুতেই ঢোকেনা নলেজে
1st assessment xm-এ খাইলাম ধরা,
মনে মনে ভাবি এখন আমার উচিৎ মরা।

নতুন নতুন টার্ম শিখতে অনেক কষ্ট
হাড্ডি গুড্ডি আর ভাইয়াদের র‍্যাগ পুরাই মাথা নষ্ট
এনাটমীতে কান্তা ম্যাম যমের আরেক নাম,
কতবার যে শেখালেন বোনসের ডান-বাম (Anatomical Position)।
তবুও শেখার ত্রুটি খেতে হয় ঝাড়ি,
ম্যাডামের কাছে আমরা সব সময়ই আনাড়ী।

Physiology' র মোমিন স্যার অস্থির মানুষ ভাই
Question's শুনে মাঝে মাঝে তব্দা খাই।
বলছি না যে হবেই কিবা বলছি না যে হবেনা,
কথার প্যাচে পড়লে আর রক্ষা পাবেনা।
Biochmistry র জসীম স্যার কাব্য প্রিয় মানুষ,
Viva বোর্ডে স্যার যেন উড়ান রঙিন ফানুস।

সহজেই যে পাশ করান দেন একটু খানি ঝাড়ি,
মাঠের মাঝে আর শহীদ মিনারে ক্লাস করার কথা ভুলতে নাহি পারি।
সদা হাস্যজ্বল নুরুল স্যার পড়াতেন সহজ করে
কিন্তু হায় কারো যে নাই মনোযোগ বোঝাবেন কেমন করে?

2nd Prof

Pathology'র রুহিনী স্যার মাটির মানুষ ভাই,
এই ক্যাম্পাসে ওনার জুড়ি দ্বিতীয়টি নাই।
সাদের স্যার গল্পে গল্পে পড়ান আমাদের,
ক্লাস নিতে কখনো করেন না হেরফের।
Pharmacology তে Evergreen ফেরদৌস স্যার' গুনের নাই শেষ
গানে গানে, খেলেন ফুটবল আহা বেশ বেশ।

পচাঁনি টা না দিলে স্যারের লাগে না ভালো,
ছেলেদের নাই লজ্জা শরম, মেয়েদের মুখ কালো।
সহজ সরল আমির স্যার রেডডী পড়ান মোদের
লেখা বুঝিনা স্যারের বলো দোষ কি আমাদের।
স্যারের কাছে আইটেম দিলে পেন্ডিংয়ের ভয় নাই,
তাইতো আমরা দল বেঁধে সবাই আমির স্যারের কাছে যাই
Microbiology তে মূসা স্যার বাঘের ন্যায় ভাই,
Inspiration এর , boss আর কোথায় পাই।

Basic question করে simply পরীক্ষা নেন স্যার
এই জন্যই ক্যাম্পাসে তার জুড়ি মেলা ভার।
Community Medicine এর কথা আর নাই বা বললাম।
যত মজা মাস্তি RFST তেই তো করলাম।

হায়দার স্যার সুবীর স্যার যত্ন করে পড়ান,
সামাজিক জ্ঞান আমাদেরই সবার মাঝে ছড়ান।
আরো অনেক কথাই বলার ছিলো বাকী,
হবে অন্য কোনদিন আর তাই আপাতত থাকি।

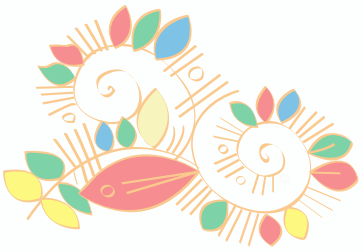

অনুভূতি

ডা. মো: ওসমান আলী
সিনিয়র প্রভাষক এনাটমি বিভাগ, টিএমসি

খুঁজছো আমায়? বৃথা চেষ্টা
পাবে না খুঁজে;
লোকের দেখা ঐ চোখ তো খোলা
কিন্তু আমার দেখা সেই কাজল কালো চোখ যে
এখনও রয়েছে বুজে।

জানো কি তুমি, আমিও খুঁজি তোমায়,
ধোঁয়া ওঠা চায়ের কাপে;
কিংবা বর্ষার আকাশে ঘুরে বেড়ানো
মেঘের ভাঁজে ভাঁজে।

হয়তো শীতের সকালে, কুয়াশার চাদরে
মোড়া সরিষার ক্ষেতে;
কিংবা আমার চাদরের ভাজে
উষ্ণতার মাঝে।

হয়তো শহুরে আঁকাবাঁকা অলিতে গলিতে,
নয়তো নদীর চর কিংবা সমুদ্র তীরের বালিতে।
আমি কিন্তু তোমায় সর্বত্রই খুঁজে পাই
ঘরের কার্ণিশ কিংবা জানালায়;
তুমি কি পাও আমায় খুঁজে-
তোমার অনুভূতির আঙ্গিনায়?!

পাহাড়ের গল্প

নিলুফার ইয়াছমিন কেয়া
Roll- 52 Batch- 10th

অনেক দিন থেকেই আমার একটা পাহাড় কেনার শখ,
কিন্তু পাহাড় কে বিক্রি করে তা জানি না।
যদি তার দেখা পেতাম, দামের জন্য আটকাতো না,
আমার নিজস্ব একটা নদী আছে সেটা দিয়ে দিতাম
পাহাড়ের বদলে।

কে না জানে পাহাড়ের চেয়ে নদীর দাম-ই বেশি,
পাহাড় স্থান, নদী বহমান,
তবু আমি নদীর বদলে পাহাড়টাই কিনতাম।
কারন আমি ঠকতে চাই না।
নদীটাও অবশ্য কিনেছিলাম একটা দ্বীপের বদলে।

ছেলেবেলায় আমার বেশ ছোট্ট-খাট্ট ছিমছাম একটা দ্বীপ ছিলো।
সেখানে অসংখ্য প্রজাপতি।
শৈশবে দ্বীপটি ছিলো বড় প্রিয়।

আমায় যৌবনে দ্বিপটিই আমার কাছে মাপে ছোট লাগলো।
প্রবাহমান ছিপছিপে তন্বী নদীটি বেশ পছন্দ হলো আমায়।
বন্ধুরা বললো। ''ঐ টুকু একটা দ্বীপের বিনিময়ে,
এত্তবড় একটা নদী পেয়েছিস।
খুব জিতেছিস তো মাইরী।''
তখন সত্যিই আমি ভালোবাসতাম নদী টিকে।
তখন আমি জয়ের আনন্দে বিহবল হতাম।
নদী আমার অনেক প্রশ্নের উত্তর দিতো,
যেমন: বলতো , আজ সন্ধ্যেবেলা বৃষ্টি হবে কিনা?
সে বলতো-
"আজ এখানে দক্ষিন গরম হাওয়া,
শুধু একটি ছোট্ট দ্বীপে বৃষ্টি; সে কি প্রবল বৃষ্টি
যেনো একটা উৎসব"।

আজ আমি সেই দ্বীপে যেতে পারি না।
সে জানতো, সবাই জানে,
শৈশবে আর ফেরা যায় না।

এখন আমি, একটা পাহাড় কিনতে চাই। সেই পাহাড়ের পায়ের
কাছে থাকবে গহন অরন্য। আমি সেই অরন্য পার হয়ে যাবো।
তারপর শুধু রুক্ষ কঠিন পাহাড়,
একেবারে চূড়ায়, মাথার খুব কাছে আকাশ।
নিচে বিপুলা পৃথিবী-
জরা জরে তীব্র নির্জনতা।
আমার কণ্ঠস্বর যেখানে কেউ শুনতে পারে না।

আমি শ্রষ্টার বাঁধা মানি না। তিনি আমার মাথার কাছে ছুটে
দাঁড়াবেন না আমি শুধু দশ দিককে উদ্দেশ্য করে বলবো
-প্রত্যেক মানুষই অহংকারী। এখানে আমি একা, এখানে
আমার কোনো অহংকার নেই। এখানে জয়ী হওয়ার বদলে
ক্ষমা চাইতে ভালো লাগে।
হে দশ দিক- আমি কোনো দোষ করিনি
আমাকে ক্ষমা করো,
ক্ষমা করো,
ক্ষমা করো।

নববধূর লজ্জা

রিফাত জেবিন চৌধুরি
রোল-৩০, ব্যাচ- ০৮

নোলক পড়া নববধূ আহা লাজে মরি,
ঘোমটা মাথায় উঠোন মাঝে রোদ বৃষ্টি গল্প করি।

দুচোখ জুড়ে স্বপ্ন ভীষণ, শিউলি ফুলের মেলা,
খুব সকালে দেখে ফিরি রোদ শিশিরের খেলা।

চুপি চুপি রোজ শালুক তুলি, দিঘির মাঝে হাসে,
নীল ফুলেদের মেশা বসে স্নিগ্ধ সবুজ ঘাসে।
কৃষক বধূ আমি একলা,
কাজের মাঝে খোলা পড়ে থাকে শরৎ
কিংবা সমরেশের কালবেলা।

ছোট্ট বাড়ি, ছোট্ট উঠোন, ছোট্ট পুকর পাড়,
সাঁতার কেটে হারিয়ে যাই ধারিনা কারো ধার।

বাবার বাড়ির দস্যিপানা কাটেনা আমার আজো
তবুও তো ফেলে রাখিনা একটা ছোট্ট কাজো।

নতুন ধানের, নতুন আলোয় মেতে উঠে চারপাশ
একখানা পাটের নতুন লাল শাড়ি হাতে ধরাই
উনি বলেন, "ভালোবাসি বউ খুব।"

যখন জোৎস্না রাতে ডিঙি নৌকৌয় নদীর মাঝে দুজন
লক্ষশত তারা তখন নদী মাঝে জ্বলে,
হাজার বছর পুরোনো রাতের গল্প তারা বলে।

সময়ের ক্ষত

মোঃ হেদায়েতুল ইসলাম
রোল-৫৭, ব্যাচ- ০৮

চলছে গাড়ি চলার মতো,
সময় ফাঁকি আর কত?
আড্ডাবাজি আছে যত,
নেশার কাছে মাথা নত,
মস্তিষ্ক আজ বিকৃত,
ইভটিজিং এ হচ্ছে ক্ষত
মা বোনের সতিত্ব।
পরীক্ষায় কেন টেনশন এত?
প্রশ্ন পাবো উত্তরসহ,
সমাজ গড়ায় ছিলাম ব্রত;
ঘুষের কাছে পরাজিত
মামা-চাচা-টাকায় যত,
চাকরি মিলছে নিয়মিত।

বাবা

জেরিন তাসনিম
রোল-৫১, ব্যাচ- ০৯

প্রত্যেকদিন 'মা' ডাকখানি শুনি যার কাছে আমি,
অন্য কেউ আর নয়তো সেজন, বাবা সে তো তুমি।
ছেলে বেলাটাকে ফেলে এসেছি অনেক বছর আগে,
তবু তোমার কাছে নিজেকে ছোট্ট ভাবতে ভালো লাগে।
দেখেছি আমি তোমার সবচেয়ে আনন্দের কারণ,
আমার অতি সামান্যতম ছোট খাটো অর্জন।
অসফলতা আর ব্যর্থতায় যখন সবাই করেছে ঘৃণা,
তখনো দিয়েছ উৎসাহ তুমি, দিয়েছ উদ্দীপনা।
আমার প্রতিটি পদক্ষেপে তোমায় পেয়েছি পাশে,
সব বাবা-ই কি তার মেয়েকে এরকমই ভালোবাসে।!
জীবনে চলার পথে জানি অনেক বাধা-ই রবে।
হোঁচট খেলেও উঠে দাঁড়াব তোমার মুখটি ভেবে।
তোমায় ছাড়া আজকের আমায় অসম্ভব যে ভাবা
গর্বিত আমি তোমার মেয়ে "খুব ভালোবাসি বাবা"।

অনুপস্থিতি

Md. Rashedujjaman
রোল-২৬, ব্যাচ- ০৯

পৃথিবীতে কোনো ফাঁকা জায়গা নেই
ফাকা থাকে না কিছুই
অনুপস্থিত মানে অনুপস্থিত
তার উপস্থিতি টের পাওয়া গেলেও
অনুপস্থিতি টের পাওয়া যায় না,
কেউ না কেউ পূরন করেই, করে ফেলেই।
না হয় না থাকা জুরে কত কত স্মৃতি পড়ে থাকে
স্মৃতির রেখায় হলেও তো কেউ কেউ
হেটে আসতো আপনজনের কাছে।

কেউ আসে না, কেউ আসবেও না
সব ফাঁকা জায়গা পূরণ হয়, হয়ে যায়
কেউ কাওকে মনে রাখেনা, রাখতে হয় না
অনুপস্থিতি ভালবাসা অনুভবের সবচেয়ে ভাল স্কেল
উপস্থিতিতে সেসব টের পাওয়া যায় না।

নীরব

মোঃ সাদমান সাকিব
রোল-৩৪, ব্যাচ- ১০

এত কথার মাঝে
আমি কি আর কই,
সবাই যখন মুখর
আমি নীরব রই।

সবাই ছুটছে উর্ধ্বশ্বাসে
যশ-খ্যাতি লাভের আশে,
আমি পথে পড়ে ওদের
পায়ের আঘাত সই।

আমি জানি না সুখ কোথায় থাকে
কোন ভোগ লালসার উজান বাঁকে
ভাটির নদীর মতো
আমি নীরব রই।

অপেক্ষা

মোঃ মেহেবুব আশরাফ ফেমাস
রোল-২১, ব্যাচ- ১০

হাতে হাত রাখা
নীরবে একটু দেখা
তারপর----------
হঠাৎ চলে যাওয়া।

জানি এর নেই কোনো ব্যাখ্যা
পাওয়া না পাওয়ার মাঝে,
থেকে যায় রয়ে যায়
শুধুই অপেক্ষা-----

এভাবে নীরবে স্বভাবে
চলে যায় দিন কেটে যায় রাত,
স্মৃতির পাতায় জমে যায় ধূলো
তবু অবুঝ মন খোঁজে ফেরে,
যদি ফিরে পায়
পুরোনো সে দিনগুলো।

Hope

Monjurun Nahar
Roll- 97, Batch- 10th

My life goes slow like a snail
Still I want to make it a beautiful tale
I hold to hope because I know
And feel it in my heart
Happiness was for away from me
It has never come to me
Year passed and life made me strong
I never case even if people tell I am wrong
A New day is here and a new quest
There are new dreams in the eyes
Hoping for it to be filled with wise.

Ailing lungs of Earth

M. Tomthin
Roll- 73, Batch- 11th

Coined as the lungs of Earth
I rang is that
Had been burst down by Earthlings
Says it is the source of O_2
Now become the source of CO_2

Amazon no longer sustains life
But become the neuwpolis of modern history
we can't complain
For it was us who caused it

Across the blue sky
A black smoke follows
For each specico cry
Why shouldn't we cry
Over end is near
No living survived without lungs

The green we burnt down
And the blackest we are watching
Just as our lives that will be in future
The home to many creatures
Has become a home of deforstation sadly
But karma sees it all
for this terrible crime
We shall be left with nothing
When the last tree is cut down
We will realize than
We can't catch money.

ডাক্তারের স্বপ্ন

ইসতেয়াক আহমেদ অর্নব
রোল-০১, ব্যাচ- ১১

ছোট থেকে মনে মনে
দেখেছি বেশ স্বপ্ন,
ভেবে ভেবে কেটে গেছে
অগণিত লগ্ন।

ভেবেছি যে আমি হব
বড় সড় ডাক্তার,
অনায়াসে দিব সেবা
পথে ঘাটে যার তার।

দেখেছি তো কত রোগী
টাকাকড়ি নেই যার,
ধুকে ধুকে মরে গেছে
না পেয়ে সে ডাক্তার।

লোকে বলে কেহ নাকি
কসাইয়েতে দেয় নাম,
সে কারণে রয়ে গেছে
আমাদেরও বদনাম।

সেদিন থেকে শপথ নিয়ে
আছি আমি বসে,
স্বল্প টাকায় দেখব রোগী
ফি নিব না কষে।

LIFE

Sambridhi Sapkota
Roll- 103, Batch- 11th

Life is in the little things we do
Things that we usually neglected and
Took for granted.
Esteem your yesterdays. Aim your tomorrows
And live your todays.

Do what you love, and do it often
If you don't like something change it
If you don't like your job quit
Stop analyzing, open your mind
Open your arms & open your heart
To new things and new people

Travel ofen, Getting lost
Will help you find yourself
Life is one time offer
Live your thoughts wear your passion.

Peace And Joy of LIFE

Upashana Khatri
Roll- 106, Batch- 11th

Peace is the way we grow
Peace is the our inner desire
Do not seek peace without
It comes from within

Peace, Peace, Peace!!
Mountain rings a sacred bell
To speak a word of wisdom
Peace is a word
Bond with every pigeon's tail
Peace, Peace, Peace!!!

Peace is the given given by the almighty
Search deep into your soul
You'll find a name of peace on it
Bring back it on earth quietly

Spread it widely, glow with intense light
Peace, Peace, Peace!!!

Raise your voice, raise your soul
Raise your family, raise your country
To raise ourselves to raise our one world
It is a lighting joy in us that connect us to ourselves
Peace, Peace, Peace!!!

নদী অথবা নৌকা

আব্দুস সোবাহান
রোল-৬০, ব্যাচ- ১১

নাগরিক গল্পের বাহিরে
একটা রাত দাও
অথবা
একটা বৃষ্টির ভোর
আঁধারের চাদরে মুখ
ডুবিয়ে দু-চোখ থেকে
নদী বয়ে যাবে
অথবা
ঝাপসা আলোয় জানালার
ওপারে ভেসে উঠবে ডুবো
ডুবো একটা নৌকা!
আমি এভাবে একটা নদী
অথবা
একটি নৌকা হতে চাই।

কুহেলিকা

মাহজাবীন রহমান
রোল-২৩, ব্যাচ- ১১

বসন্তদিনে কুহেলিকার গানে
কৃষ্ণচূড়া মর্তে নেমে এসেছে
নির্জন ক্ষণে সঙ্গোপনে
মেতেছে ওরা অবুঝ প্রেমে
মর্ত বলে, কেন তুমি এলে
কোন প্রণয় অভিসারে
ভালোইতো ছিলে অমরাবর্তীতে
কী পেলে শুষ্ক ধরাতে নেমে এসে?
কিছুই তো দিতে পারি নি তোমাকে,
কুসুম নির্যাস তবে কেন আমার তরে।
কৃষ্ণকলি হেসে বলল,
রাত ছাড়া দিন যেমন মূল্যহীন
তুমিহীনা অমরালয় রিক্ত শোভাহীন
কাটে না যেন ক্ষীণ প্রহর তুমি বিহীন
শেষ হোক প্রতিক্ষিত বিষাদময় দিন।
কুহেলিকা আজও গান গায় আপন মনে
আগুন প্রেমে মজেছে মর্ত এখন বসন্ত দিনে।

College Days

Nisha Dhaubanjar
Roll- 99, Batch- 11

Making friends and memories,
That will last forever in my mind
Learning the lessons that will mold,
Me into the person I will find

Discovering the possibility of
Choices that I will need to make
Wondering about the challenges,
That lie on whatever path I take

Listening to my heart, I set a course,
For the goals I wish to achieve
And now I begin the journey of my dreams,
knowing that all I need is to believe.

EDHOU

(A tribute to my grandfather)

Hanjabam Deepashree
Roll- 71, Batch- 11th

Enjoy your life
he used to say
Travel the world
Wake up late on some days,
Dance in the rain,
Laugh with your heart
Now that he is gone
I can feel the empty void,
However, feeling he is still around,
Taught me to stand alone
To stand out in crowd
And a lot more things that made me 'ME'
Little things in life mattered
He liked the bugs that crawl
The dew drops on the grass,
Early morning sunshine that pampers the body,
The evening sky reviewing his memorize,
He'll forever in my heart
Always alive,
How I miss your voice
Your stories
Your smile
Your warmth
I'll keep you alive in all my thoughts,
My actions
My prayers
For you are the man where believed in me
I strongly love you and will always do

আমাদের টিএমএসএস

ফারিহা হক
রোল-৪৫, ব্যাচ- ১১

চার দেয়ালের দালান নয়
স্বপ্নমাখা কুটির;
ব্যস্ততার ধারা নয়
মুখরতার করিডোর,
ক্লান্তিভরা সোপান নয়,
সফলতার জোয়ার।

মন খারাপের মুখটি নয়
আবির মাখা হাসি,
গরীব দু:খীকে সেবা দিতে
আমরা ভালোবাসি।

বিষন্নতার গুমোট নয়
উচ্ছলতার ঝলক,
সেবা দেয়ার প্রতিজ্ঞাই
টিএমএসএস এর রৌনক।

রোগ শোকের যন্ত্রনা নয়
স্টেথোস্কোপের মন্ত্রনা;
স্যার ম্যাডামদের বকাবকি নয়
বুকভরা ভালোবাসা।
ক্লাসের ফাঁকে চায়ের টেবিলে
আনন্দতার ঢেউ
আমাদের এখানে
পর নয়কো কেউ।

এখন আমি করবো
আমার কবিতা শেষ;
এই আমাদের
স্বপ্নভরা টিএমএসএস।

বাংলা না ইংরেজি

মোঃ মিজানুর রহমান
সিও, টিএমসি।

ইংরেজিরও বাবা আছে, বাংলারও বাবা আছে।
একদিন বৃষ্টির সন্ধ্যায় ন' তলার ঘরে
ইংরেজির সঙ্গে দেখা হল বাংলার।

বাংলা বলল, 'ইংরেজি তোমাকে কী সুন্দর দেখতে
ঝকঝকে দাঁত, মোম মাখা পা, পরিষ্কার গোড়ালি
চুল কেটে ফেলার পর তোমাকে আরো ভালো দেখাচ্ছে।'
ইংরেজি বলল, 'ও রিয়্যেলি! আমি ভাবলাম, য়্যু হেট মি,
তুমি আমার হেয়ার-স্টাইল ডিসলাইক করবে।'
বাংলা বলল, 'আমার হাতে পায়ে মাটি, চুল আঠা
গায়ে এখনো চর্ষাপদের ঘাস, থাকতাম সেই গ্রামে
তোমাকে দেখে লোভ হল, বাবা মাকে ফেলে
ঢাকায় চলে এলাম। আমার এই কালো কালো হাত
কালো কালো লোম ভর্তি পা, এসব দিয়ে এখানে
কিচ্ছু হবে না, আমি গ্রামে ফিরে যাব।'
ইংরেজি সিগারেট ধরিয়ে বলল, 'নো, নো, য়্যু লুক সো ম্যানলি
তোমার গায়ে মাটি, আই লাইক ইট, আই লাইক আর্থ
তোমার চুলের গন্ধ, আমি তোমাকে ভালোবাসি
ডু য়্যু লাভ মি? দেন, কাম, এসো লেট আস মেক লাভ।

কিন্তু বছর পাঁচেক বাদে একদিন
বাংলা আর ইংরেজির মধ্যে তুমুল হাতাহাতি
(ততদিনে প্রাইমারি থেকে ইংরেজি উঠে গেছে)
রাস্তায় ইংরেজি মাধ্যমের আর বাংলা মাধ্যমের
ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা সবাই বেরিয়ে এল
ইংরেজি বলছে, 'আই হেট য়্যু'
বাংলা বলছে, 'আমি তোমায় ভালোবেসেছিলাম'
ইংরেজি বাংলার চুল ছেড়ে দিয়ে, কলার ছেড়ে দিয়ে
হাত থেকে ঘাসপাতা ঝেড়ে ফেললো
কিন্তু বাংলা ততদিনে ইংরেজি শিখে গেছে
ইংরেজির পশ্চাতের দিকে তাকিয়ে
মুখ বিকৃত করে উচ্চারণ করল, বিচ।

ধাঁধা

নোশীন রায়হান
রোল: ৫৭ টিএমসি: ১১

১। বন থেকে বের হলো টিয়া, সোনার টুঁপি মাথায় দিয়া।
উত্তর : আনারস

২। লাল বুড়ি হাটে গেল,
হাঁটে গিয়ে থাপ্পড় খেল।
উত্তর : মাটির পাতিল।

৩। গালে দিলে নগন্য,
পায়ে দিলে ধন্য।
উত্তর : জুতা।

৪। তিন অক্ষরে নাম যার জ্বালানি বোঝায়, মাঝের অক্ষর বাদ দিলে ফল কে বোঝায়।
উত্তর : কয়লা।

৫। ডুবে যায় কিন্তু ভেজেনা, বলতো কি?
উত্তর : সূর্য।

৬। নদীর এপারে সোয়ভ শিয়াল, ওপারে সোয়া শিয়াল। মোট কয়টা শিয়াল?
উত্তর : দুইটা।

৭। আল্লাহর কি কুদরত, বাঁশের ভেতর শরবত।
উত্তর : আঁখ।

৮। লাল রঙের রেলগাড়ি, টোকা দিলেই জিলাপি।
উত্তর : কেল্লা

৯। লম্বা সাদা দেহ তার মাথায় টিকি রয়, টিকিতে আগুন দিলে দেহ হবে ক্ষয়।
উত্তর : মোমবাতি।

১০। কোন ব্যাংকে টাকা থাকেনা-
উত্তর : ব্লাড ব্যাংকে।

১১। খেতে গেলে উল্টে লও, লাগলে মুখে তেঁতুল দাও।
উত্তর : ওল।

১২। জলে চলে কিন্তু ভেজেনা, বলতো কি?
উত্তর : জোনাকী।

১৩। উকটান বুকটান, কোন জিনিসের তিন কান-
উত্তর : চুলা।

১৪। আগা কেটে বাগা কেটে বসাইলাম চারা, ফুল নেই, ফল নেই, পাতাতেই ভরা।
উত্তর : পান।

১৫। না মিললে হবেনা, ভেবে চিন্তে বলো না-
উত্তর : হিসাব।

তথ্য কনিকা

নোশীন রায়হান
রোল: ৫৭, টিএমসি: ১১

১। 'ফ্লি' নামের এক ধরনের কীট এক লাফে নিজ শরীরের ৩৫০ গুন দৈর্ঘ্য অতিক্রম করতে পারে। ব্যাপারটি অনেকটা একজন মানুষের একলাফে একটা ফুটবল মাঠ অতিক্রম করার মতো।

২। প্রতি মিনিটে পুরো বিশ্বে ৬০০০ বা তার অধিকবার বজ্রপাত হয়।

৩। মধু একমাত্র খাদ্য যা কখনো পঁচেনা।

৪। ব্রাজিলের একটি রাস্তার নাম 'দ্যা মুনমেন্টাল অ্যাক্সিম' এই রাস্তাটি এতোই প্রসস্থ যে ১৬০ টি গাড়ি পাশাপাশি চলতে পারে।

৫। পৃথিবীতে ২২ হাজার প্রজাতির পিঁপড়া বাস করে, বাংলাদেশে পিঁপড়া প্রজাতির সংখ্যা ১৩০ থেকে ২৫০ এর মতো।

৬। যুক্তরাষ্ট্রের ৯৯ শতাংশ মিষ্টি কুমড়া ব্যবহৃত হয় গৃহসজ্জায়।

৭। হাঁচি দেওয়ার সময় যে বাতাস নির্গত হয় তার গতিবেগ থাকে হ্যারিকেন ঝড়ের মতো।

৮। মানুষ ধরতে যেমন আঙ্গুলের ছাপ ব্যবহৃত হয় তেমনি কুকুর ধরতে নাকের ছাপ ব্যবহৃত হয়।

৯। তেলাপোকা ৪৫ মিনিট পর্যন্ত দম বন্ধ করে থাকতে পারে।

১০। প্রাচীন মিশরের সিংহের দেহ ও মানুষের মাথার বিশিষ্ট পাথরের মূর্তির নাম স্ফিংস।

ফেলে আসা স্মৃতিঃ

- Seminar, Symposium & Workshop
- Study tour
- Nantional Day Observance
- Festival Celebration
- Student Week
- Annual Parents Day
- Health Fair
- Fresher's program
- Year ending program
- Club activities.

এক ডজন হাসি (সংগৃহীত)

বাড়ীওয়ালা ঃ এতো অল্প ভাড়ায় এতো সুন্দর বাড়ী আপনি কোথাও পাবেন না।

ইতিমধ্যে বৃষ্টি শুরু হওয়ায় ফাটা ছাদ দিয়ে ঘরের মধ্যে পানি পড়তে শুরু করলো।

ভাড়াপ্রার্থী ঃ আপনি বললেন এতো সুন্দর বাড়ী! এখন দেখছি ফাটা ছাদ দিয়ে ঘরের ভিতর পানি পড়ছে।

বাড়ীওয়ালা ঃ আরে মশাই! পানিতো আর সবসময় পড়েনা! যখন বৃষ্টি হয় শুধু তখনই পড়ে! অন্য সময় একটুও পানি পড়েনা।

মাঝরাতে এক লোক একটি বাড়ীর বাইরে পায়চারি করছিলেন। তাই দেখে টহল পুলিশ তাকে ধরে থানায় নিয়ে গেলেন।

পুলিশ ঃ কি উদ্দেশ্যে আপনি মাঝরাতে একটি বাড়ীর বাইরে পায়চারি করছিলেন এর সঠিক জবাব চাই।

লোকটি ঃ আরে ভাই! এর সঠিক জবাব যদি আমার জানা থাকতো তাহলে সেটা আমার বউকে বলেতো বাড়ীর মধ্যেই ঢুকতে পারতাম।

বিচারক ঃ বলুন! গভীর রাত্রে আপনি অন্যের বাড়ীর ভিতর কেন ঢুকেছিলেন?

লোকটি ঃ হুজুর রাতের অন্ধকারে মনে হয়েছিলো ওটা আমার নিজের বাড়ী।

বিচারক ঃ তাই যদি হয় তাহলে ঐ বাড়ীর বউটি ঘরের বাইরে এলে তাকে দেখে আপনি পালানোর জন্য দৌড় দিলেন কেন?

লোকটি ঃ হুজুর অন্ধকারে বুঝতে পারিনি, ওনাকে আমার বউ মনে হয়েছিলো।

❖ অষ্ট্রেলিয়ার মেলবোর্নে দুগ্ধ দোহন প্রতিযোগীতা হচ্ছে। সেখানে অনেক দেশ হতে আগত প্রতিযোগীদের সাথে এক বাংলাদেশীও অংশগ্রহণ করেছেন। প্রতিযোগীতা শেষে দেখা গেলো একজন সর্বোচ্চ ২০ লিটার দোহন করেছেন। তাকে বিজয়ী ঘোষণা করা হলো। বাংলাদেশী তখন দাড়িয়ে বললেন আমি এটা মানিনা। কেন মানেন না! আপনি তো মাত্র এক লিটার দোহন করেছেন! আরে ভাই সেটাইতো কথা! সবাইকে দিয়েছেন একটা করে গাভী আর আমাকে দিয়েছেন একটা আস্ত বলদ! আমি সেটাকে দোহন করেই এক লিটার বেড় করেছি যা অন্যদের পক্ষে অসম্ভব।

❖ এক ছেলে বিয়ে করবে কিন্তু কোনক্রমেই মেয়ে পছন্দ হয় না। মেয়ে দেখে চলছে তো চলছেই। অবশেষে বন্ধু বান্ধব একদিন শুনলো ও বিয়ে করে বউ ঘরে এনেছে। সবাই আগ্রহ ভরে বউ দেখতে আসলো কিন্তু বউ দেখে বন্ধু বান্ধব হতাস। বউ খুবই ছোট খাট। কিরে এতোদিন এতো মেয়ে দেখে শেষ পর্যন্ত এই ছোট খাট মেয়েকে বউ করলি। আরে দোস্ত তোরা বুঝবি না বিপদ যতো ছোট হয় ততই ভাল।

❖ রেল ভ্রমনে এক অপূর্ব সুন্দরী মেয়ের পাশে একটি সিট খালি হলো।
মেয়েটির পাশেই একজন তরুণ এবং একজন বৃদ্ধ লোক দাড়িয়ে ছিলো। তখন তরুণ লোকটি মেয়েটিকে বললো, আমিতে আপনার ভাই এর মতো আমি কি আপনার পাশে বসতে পারি? কিন্তু মেয়েটি কোন জবাব দিলনা। তাই দেখে বৃদ্ধ লোকটি কাছে গিয়ে বললো মা আমি তোমার বাবার মতো আমি কি তোমার পাশে বসতে পারি? তবুও মেয়েটি কোন জবাব দিলনা। পরবর্তী ষ্টেশনে নামার আগে মেয়েটি বললো এবার আপনারা পিতাপুত্র এখানে বসুন!

❖ এক লোক কানের ডাক্তারকে গিয়ে বললো ডাক্তার সাহেব আমার বউ কানে শোনেনা।
ডাক্তার বললেন তবেতো একটা পর্যবেক্ষণ দরকার। আপনি যখন গেট দিয়ে বাড়ীতে ঢুকবেন তখন আপনার বউকে লক্ষ্য করে বলবেন এই কি করো? যদি উত্তর না দেয় আরও একটু কাছে গিয়ে একই প্রশ্ন করবেন। যদি তাও না শোনে তখন একদম কাছে গিয়ে একই প্রশ্ন করবেন। এটা করে আগামীকাল আসুন। লোকটি গেট দিয়ে ঢুকেই বউকে লক্ষ্য করে এই কি করো? উত্তর নাই, আরও একটু কাছে গিয়ে এই কি করো? উত্তর নাই, একদম কাছে গিয়ে এই কি করো? তখন বউ বিরক্ত হয়ে বললো এইবার নিয়ে তিনবার বললাম মাছ কাটি।

❖ এক হোটেলের সিঙ্গারা এক লোকের খুবই ভালো লেগেছে। পরের দিন আবার একই হোটেলে সিঙ্গারা খেতে গেলেন। কিন্তু আগের দিনের মতো ভালো লাগলো না। তখন বয়কে ডেকে বললো গতকালের সিঙ্গারাতো খুবই ভালো ছিলো। আজকেরটা এতো খারাপ কেন? খারাপ হবে কেন? আপনাকে তো গতকালের গুলোই দিয়েছি।

❖ গ্রীষ্মের দাবদাহে বটবৃক্ষের ছায়ায় বিশ্রামরত দুই বৃদ্ধের আলাপ পরিচয়। একজন এসেছেন ঘোড়ায় চড়ে, অন্যজন এসেছেন গাধায় চড়ে। বিদায় বেলায় গাধার মালিক ঘোড়ার মালিককে বললো, আসুন আমরা এই মিলন মূহুর্তকে চিরস্মরণীয় করে রাখি। আমার গাধাটা আপনি নিন, আর আপনার ঘোড়াটা আমাকে দিন। তখন ঘোড়ার মালিক বললো আপনার কি মাথা খারাপ। তখন গাধার মালিক বললো না। আপনার মাথা খারাপ কিনা তাই পরীক্ষা করলাম।

❖ গরীবের ছেলের হাতী দেখার খুব শখ কিন্তু বাবা তার ইচ্ছা পূরণ করতে পারেনা। হঠাৎ একদিন দেখা গেল ভীষণ মোটা কালো এক মাহুত হাতীতে চড়ে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে। বাবা ভাবলো বিনে পয়সায় ছেলেকে হাতী দেখানোর এটাই সুযোগ। তাড়াতাড়ি বাড়ী গিয়ে ছেলেকে নিয়ে এসে বললো ঐ দেখ হাতী। তখন ছেলে বাবাকে জিজ্ঞাস করলো বাবা হাতী কোনটা উপরেরটা না নীচেরটা।

❖ ঘটনাক্রমে দুই ঠগ ট্রেনে উঠেছে। একজনের পায়ে ছিল শুধু মোজা। অন্যজনের পায়ে শুধুই জুতা। জুতাওয়ালা ঠগ জুতা খুলে আরাম করে পা উঠিয়ে বেঞ্চে বসেছেন। ইত্যোবসরে মোজাওয়ালা ঠগ জুতা পায়ে দিয়ে চলে যাওার উপক্রম করছে। তখন জুতাওয়ালা ঠগ বললো কি ভাই আমার জুতা লইয়া কই যান? কি বলেন আপনার জুতা! কি করে সম্ভব এই দেখেন আমার পায়ে মোজা। কামরার সবাই মোজাওয়ালার পক্ষ নিলে তখন জুতাওয়ালা ঠগ মোজাওয়ালা ঠগের পাশে রাখা নতুন ছাতা দ্রুত হাতে নিয়ে বললো এবার বলেন এটাও আপনার।

❖ এক বৃদ্ধ ফকির রাস্তার পাশে বসে প্রাকৃতিক কার্য সম্পন্ন করে চলে যাচ্ছে। কিছু ছেলেপেলে ঘটনাটা চাক্ষুষ করে ফকিরের পিছু লাগলো, কি ফকিরের ব্যাটা কাম সারলাতো পানি ব্যবহার করলানা। আর বলিসনা, এ সমস্ত আর ভালো লাগেনা।

সংগ্রহে
ডাঃ এম, এস, এ সরকার
এনাটমী বিভাগ, টিএমসি।

কৌতুক

Rifat Jebin Choudhury

TMC-08, Roll- 30

১ম বন্ধু : বন্ধু তোর মন খারাপ কেন?
২য় বন্ধু : ভাইয়া এক্সিডেন্ট করেছেন, ডান হাত ভেঙ্গে গেছে সব কাজ করে দিতে হচ্ছে।
১ম বন্ধু : ভাগ্যিস দুইসিডেন্ট করেনি তাহলে দুইহাত ই ভেঙে যেত! তখন বাম হাতের কাজটা কে করে দিত?

আফিয়া জাহিন

রোল ৬৬ টিএমসি: ১১

এক.

একজন লোক পানের দোকানে খেতে বসেছে। বলছে, ভাই একটা পান দেন। দোকানদার পান রেডি করে বলছে,

দোকানদার : আপনি কিভাবে পান খান?
লোকটি : কীভাবে আবার, দাঁত দিয়ে।
দোকানদার : আমি তা বলছিনা, আপনি পানটি কী দিয়ে খাবেন?
লোকটি : আরে ভাই, বললাম তো দাঁত দিয়ে খাব।
দোকানদার : আপনি কি খয়ের খান?
লোকটি : আরে কী বলছেন, আমি তো কাদের খান।

দুই.

ছেলে ও বাবা টেবিলে খেতে বসেছে।

ছেলে : বাবা! তেলাপোকা খেতে কেমন?
বাবা : খাওয়ার সময় বাজে কথা বলতে হয়না। চুপচাপ খাওয়া শেষ করো। পরে শুনবো । একটু পরে।
বাবা : হুম, কী যেন বলছিলে তুমি?
ছেলে : বলছিলাম ডালে একটি তেলাপোকা পড়েছে। কিন্তু তুমি তো সবটুকু ডাল খেয়ে ফেলেছো।

Sanzida Akter Rasna

Roll: 54 TMC: 11

Category : Jokes

1. Boss : What would you describe the term “exchange of opinions”?
   Employee : That’s a situation when you have your opinion and go with it to your boss. Then you return with his opinion.
2. Rony : Why was the math book sad?
   Rakib : Because it had too many problems.
3. Patiant : Doctor, I have a pain in my eye whenever I drink tea.
   Doctor : Take the spoon out of the mug before you drink.
4. Husband : Honey, both that journalist and the engineer proposed to our daughter! So who’s the lucky man?
   Wife : The engineer. Because our daughter married the journalist.
5. Teacher : If you had one taka and asked your father for one more taka, how much would you have in total?
   Student : One taka.
   Teacher : You don’t know your maths.
   Student : You don’t know my dad.
6. A Politician is late to the meeti.ng, He drives his car into parking, but could not find a place to park the car. Then he raises his eyes to heaven and asks God: ‘Please help me to find a place. If you help me. I promise I ‘ll go to church every Sunday and quit drinking’’
   Then, suddenly, he notices a free place for a car.
   He raises again his eyes to heaven: I have found by myself and don’t need your help anymore’’.

ফটো গ্যালারী

ছাত্র সপ্তাহ

শিক্ষা সফর

ডিএনএ ল্যাব ভিজিট

আরএফএসটি

বার্ষিকী অনুষ্ঠান

বর্ষবরণ অনুষ্ঠান

মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস

জাতীয় শোক দিবস

পরিদর্শন

Inspection Team of
Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University (BSMMU)

TMC Briefing on QAS
Md. Ali Noor,

Quality Monitoring Committee

In Honour of

সেমিনার

ট্রেনিং কর্মশালা

অনলাইনে ক্লাস

লেকচার গ্যালারী

পরীক্ষার হল

সেমিনার হল